দিন গত হইল, অমৃতবাবুর "Three years in Europe" গ্রন্থখানি পড়িতেছিলাম, এই গ্রন্থে পাশ্চাত্য বিবাহ সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা লেখা আছে, উহা পাঠ করিয়া বড়ই বেদনা পাইলাম উহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

'The proportion of unhappy marriages is larger in England. than in India, still larger in America. After close observation during six years devoted specially to the study of social phenomena in the west, I have come to the conclusion that the proportion of unhappy marriages in England and America is due to the very conception of marriages, upon which the present reform agitation is based, namely as an instrument of attaining personal happiness and not as a means of serving family and society of making others happy besides the couple themselves."

পাঠক। আত্মসুখমত্ততা ও সাজসজ্জা, বসন ভূষণ, আহার, বিহারাদিতে সংযমশূন্যতা কতদূর অনিষ্ট সাধন করিতে পারে, তাহা ঐ উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিয়াই ধারণা করিতে পারিবেন। আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতা ভালবাসিয়া যদি আমাদের গৃহধর্ম্ম তাহাদের ন্যায় অশান্তিময় করিয়া তুলি, তাহা আমাদের হইলে গৃহস্থ-ধর্ম্মের বিশেষত্ব কি রহিল? পাশ্চাত্যভাব আমাদের সমাজে প্রবেশ করিয়া সমাজটার ভিত্তি অনেকটা টলাইতেছে দেখিয়া গিরিজা প্রসন্ন পূর্ব্ব হইতেই সতর্কিত হইয়াছিলেন এবং সমাজটা রক্ষা করার জন্য ঐ সব সারগর্ভ উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

গৃহ-লক্ষ্মীর আবির্ভাবে সমাজের মহা ইষ্ট সংসাধিত হইয়াছে। স্বামী উপদেষ্টা স্ত্রী-শ্রোতা। গ্রন্থকার স্ত্রীকে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত করিয় স্বামীকে অসাধারণ পণ্ডিত সাজাইয়াছেন। স্বামী এমনই কৌশলে স্ত্রীর নিকট

গৃহলক্ষ্মীর আবির্ভাবে সমাজের মহাইষ্ট সংসাধিত হইয়াছে। কেবল রমণীগণ কেন শিক্ষাভিমানী অসংযত যুবকের নিদ্রা গৃহলক্ষ্মীর সার উপদেশে অনেকটা ভাঙ্গিয়াছে।

স্বামী ও স্ত্রীর কথোপকথন স্থলে গৃহলক্ষ্মীতে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, স্বামী উপদেষ্টা স্ত্রী শ্রোতা। গ্রন্থকার স্ত্রীকে সাধারণ শ্রোতা'র শ্রেণীভুক্ত করিয়া স্বামীকে অসাধারণ পণ্ডিত সাজাইয়াছেন স্বামী এমনই কৌশলে স্ত্রীর নিকট জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিতেছেন যে, স্ত্রী বক্তার ভাব দেখিয়া অশিক্ষিতা হইয়াও বিস্ময়াকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিতেছে না, স্বামী দুর্গম বিষয়গুলি কখন বা সরল ভাবে ২।৪ কথায়, কখন বা দৃষ্টান্ত দ্বারা কখন বা তিরস্কার করিয়া, কখনও বা আবদার করিয়া, স্ত্রীর বোধগম্য করাইয়াছেন, এই গ্রন্থের বক্তা যদিও অসাধারণ পণ্ডিত তথাপিও অশিক্ষিতা স্ত্রীকে জটিল বিষয় শিক্ষা দেওয়ার সময় একবিন্দুও ধৈর্য্যচ্যুত হয়েন নাই, বা কোনস্থলে অভিমান বা গর্ব্ব প্রকাশ করেন নাই, বরং দুই একটা সার বিষয়ে স্ত্রীর মন আকৃষ্ট করার জন্য বক্তা বড়ই নিরভিমানিতার পরিচয় দিয়াছেন, পতি নিরভিমানী না হইলে তিনি অশিক্ষিতা স্ত্রীকে শিক্ষা প্রদান করার সময় তাহার মনে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন না। মনের ভিতর প্রভুত্ব লাভ না করিতে পারিলে, উপদেশ ফলোপদায়ক হইবে কেন? এই গ্রন্থের বক্তা স্বামী যাহাতে অল্প কথায় স্ত্রীর হৃদয়খানি আকর্ষণ করিতে পারেন, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছেন, এই চেষ্টার ফলে স্ত্রী স্বামীর উপদেশের মর্ম্ম অতি সহজেই গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, যাহারা স্ত্রীকে শিক্ষিতা করিতে চাহেন, তাহারা গৃহলক্ষ্মী প্রণেতার কৌশলটি গ্রহণ করিবে

অবিলম্বে মনোবাসনা সিদ্ধ করিতে পারিবেন। গ্রন্থকারের বলিবার কিরূপ ভঙ্গি তাহা পাঠক বর্গকে জানাইবার জন্য এরূপ প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

'প্রকৃত পক্ষে যিনি' প্রেমিক, তিনি সর্ব্বগুণ ভূষিতা, তিনি দেবতা। প্রেম সংকীর্ণ স্বার্থকে ধ্বংস করে, প্রেম আত্মসংযমে সমর্থ করে, প্রেমে সন্তোষ জন্মায়, প্রেমে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিশালী করে, প্রেমে হৃদয়-রাজ্যকে স্বর্গ করিয়া দেয়।

চৈতন্য প্রেম-শিক্ষা দিয়াছেন বলিয়া তিনি আজিও সর্ব্বত্র পূজিত, বুদ্ধ প্রেমশিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া তিনি আজিও দেবতা। আমি যদি ইহার গুণের কথা বলিতে পারিতাম তবে কেবল বুঝি প্রেম শিক্ষা দিলেই সফল হইয়া যাইত।"

এই কথাগুলি শ্রবণ করিয়া আমরা গ্রন্থকারের কি একটা ছবি আমাদের মানসনেত্রের সম্মুখে দেখিতে পাই না? আমরা কি ধারণা করিতে পারিনা যে প্রেমের গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি এতই ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন যে. এ সময় তাঁহার বাক্য শ্রবণ অপেক্ষা তাহার মুর্ত্তিদর্শন করিলে প্রকৃত প্রেম দর্শকের হৃদয়ে আবির্ভাব হইত। বাস্তবিক ততক্ষণ মধুপ মধুপানের আশায় পুষ্প স্তবকের চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া গুণ গুণ রবে গান করিয়া বেড়ায, যতক্ষণ সে পুষ্পের মধুপান আস্বাদন করার সুযোগ না পায, একবার সেই রস তাহার রসনা স্পৃষ্ট হইলে সে যেমন মধু ফেলিয়া আর গুণ গুণ করিয়া কালক্ষেপ করে না, তদ্রূপ কোন একটা চিত্তহারী বিষয়ে প্রবেশ লাভ করার পূর্ব্বে মানুষ নানারূপ বাক্যব্যয়ে কাল কাটায়, যখন সে সেই বিষয় রসে নিমজ্জিত হইতে পারিল, তখন কি আর সে অজস্র বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহার রস অন্যকে জ্ঞাপন করার জন্য অধিক উতলা হয়? সে তখন সেই উৎকৃষ্ট বিষয়ে এত তন্ময়তা লাভ করে যে এই বিষয়টি অপরের কর্ণগোচর করিয়া যে একটু পরিতৃপ্তি লাভ করা যায়, তাহা সে সময় সে অণুমাত্র আকাঙ্খা করে না। গ্রন্থকার শত সহস্র পৃষ্ঠা লিখিয়া প্রেম সম্বন্ধে আমাদিগকে যাহা না বুঝাইতে পারিতেন, তিনি প্রেম সলিলে ডুব দিয়া যখন বলিলেন "আমি যদি ইহার গুণের কথা বলিতে পারিতাম, তবে বুঝি প্রেম শিক্ষা দিলে সকলই হইয়া যাইত, "তখন আমরা প্রেম সম্বন্ধে অনেক বুঝিলাম ও তাহার শ্রেষ্ঠতা ধারণা করিতে পারিলাম, কোন বিষয় বর্ণনা করার পূর্ব্বে সেই বিষয় সাগরে ডুব দিয়া তন্ময়তা লাভ করিতে পারিলে, বর্ণিত বিষয়টি সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে। কেবল হৃদয় আকর্ষণ কেন সেই বিষয় বর্ণনার সময় যে সব বাক্যাবলী প্রযুক্ত হয়, তাহা হইতে একটা অসাধারণ শক্তি বিস্ফুরিত হইয়া শ্রোতার দেহ মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে শক্তিশালী করিয়া তুলে, গিরিজা প্রসন্নের লেখায় এইরূপ তন্ময়ত্বের বহুল পরিচয় পাওয়া যায়। আমি মনে করি গিরিজা প্রসন্নের রচনায় তাহার তন্ময়তাই বিশেষত্ব।

অনেকে বলেন যে গ্রন্থকার স্ত্রীলোকগণকে বশীভূত রাখার জন্য সংসার ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি কঠোর নিয়ম তাহাদের ঘাড়ে চাপাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন, পুরুষ জাতিকে কোন বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ করিতে চাহেন নাই। প্রকৃত বিচার করিয়া দেখিলে গ্রন্থকারকে এ দোষে অভিযুক্ত করা যায় না। অনেকস্থলে তিনি পুরুষদের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে যে সব উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে তাহাদিগের কুসংস্কার গুলি শাস্ত্র ও যুক্তিবলে শাসিত করার চেষ্টা হইয়াছে বই কি? প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি ভয়ে এস্থলে দৃষ্টান্তের অবতারণা সঙ্গত বোধ করিলাম না। যাহারা পুরুষ জাতির ধর্ম্মটা কেবল স্বাধীনতার উপর

স্থাপিত দেখেন, তাহাদের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে, মহাভারতকারও কি আমাদের ন্যায় নিষ্ঠুর ছিলেন, শাণ্ডিলী প্রভৃতির উপখ্যান পাঠ করিলে জানা যায় যে, প্রাচান কাল হইতেই স্ত্রীজাতি সংসার ধর্ম্ম রক্ষার জন্য স্বেচ্ছাক্রমে কঠোর নিয়মাদির অধীনে থাকিতেন, এবং তদ্দ্বারা গৃহধর্ম্মের বিশেষত্ব সংরক্ষিত হইত। যাঁহারা কালীদাস প্রণীত শকুন্তলা নাটক পাঠ করিয়াছেন, তাহারা শকুন্তলার প্রতি মহাতপা কণ্বমুনির উপদেশটি স্মরণ করিবেন। পতি গৃহে স্ত্রীর কিরূপ কর্ত্তব্যতা, তাহা বলিয়াদিতে হইলে কণ্বমুনির ন্যায় একটু কর্ত্তব্য পরায়ণ হইতে হয় বই কি? ঐ শ্রেণীর উপদেশের মূলে নিষ্ঠুরতা নহে, কর্ত্তব্য পরায়ণতা।

স্ত্রীলোকগণ প্রাচীন কালে ঐরূপ কঠোর উপদেশের ফলে কর্ত্তব্য বন্ধনে আবদ্ধ হইতেন বলিয়াই হিন্দুর গৃহস্থাশ্রমে সর্ব্বতীর্থ বিরাজ করিত।

প্রাচীনকালে পুরুষজাতি যে কর্ত্তব্য পালনের জন্য স্ত্রীজাতি অপেক্ষাও অত্যধিক কঠোব, স্বার্থত্যাগী, ও ধর্ম্মাধীন ছিলেন, তাহার প্রমাণ দিলীপি, শ্রীরাম চন্দ্র,ও অর্জ্জুন প্রভৃতি মহাপুরুষ গণ। তাঁহারা আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধির জন্য যে সব কঠোর নিয়মাধীন হইতেন, তাহার তুলনায় স্ত্রীজাতির কঠোরতা অতি লঘু নয় কি? গিরিজা প্রসন্নকে স্ত্রীজাতির প্রতি কঠোর আদেশ প্রদানের জন্য দোষী করা শাস্ত্রদর্শী-লোকেব উচিত নহে। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি—গৃহলক্ষ্মীতে ঐশ্রেণীর উপদেশ সন্নিবিষ্ট না হইলে, উহা বিজ্ঞ লোকের নিকট আদৃত হইতনা, পরন্তু সমাজেরও অনিষ্ট সাধিত হইত।

যেসব গ্রন্থে অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থার সমালোচনা থাকে; এবং অতীতের ছায়ার উপর বর্ত্তমানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সব গ্রন্থে বিশেষ চিন্তাশীলতার কথা থাকে। এবং সেই সব গ্রন্থে লোকপরিণতির শিক্ষা ও অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। গিরিজা প্রসন্নের এই গ্রন্থ খানিও অতীতের ছায়ার উপর সংস্থাপিত,কাজেই বিশেষ উপকারী ও জাতীয় জীবন গঠনেব সহায়, দৃষ্টান্ত স্থলে আমরা তাহার পুস্তক হইতে একটী স্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

পাপের লীলাস্থল নরকরে নাট্যভূমি দুঃখ যন্ত্রণা পূর্ণ এসংসারে রমণীর সতীত্ব স্বর্গীয় ধন, এই দুরবস্থায় ঘোর দুর্দ্দিনে—অশান্তির অমানিশায়, নারীর সতীত্ব আর্য্যগৃহে উজ্জ্বল মাণিক, আর্য্য স্বামীর নিকট স্ত্রীর সতীত্ব বড় আদরের ধন, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। আর্য্য-হৃদয় সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারে, হাসিতে হাসিতে রণ ক্ষেত্রে আপনার জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু প্রাণ থাকিতে রমণীর সতীত্বের বিন্দুমাত্র অপমান সহিতে পারেনা। তাঁহাকে জলন্ত অনলগর্ভে নিক্ষেপকর, সে অটল রহিবে কিন্তু সাবধান, তাঁহার হৃদয়-ধনের একটুও অবমাননা করিতে যাইও না, তাহা হইলে প্রমাদ ঘটিবে! পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দ্দূল পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া প্রাণান্তিক আক্রমণ করিবে। যখন মুসলমানের অত্যাচারে আর্য্যদেশ প্রপীড়িত ছিল, যখন ইন্দ্রিয় পরায়ণ বিলাসী ঘোর নারকী যবন সম্রাটগণ আর্য্য নারীর এই মহামূল্য ধন অপহরণ করিতে শত সহস্র মানবের জীবন তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া নর শোণিতে রণস্থল প্লাবিত করিত তখন (হায় সে কথা বলিতে বুক ফাটিয়া যায়-শিথিল অঙ্গ ও সিংহ বিক্রম ধারণ করে।) আর্য্য দেবগণ বরং নিকটে দাঁড়াইয়া অশ্রুধারায় ভাসিতে ভাসিতে সেই সকল গৃহলক্ষ্মীর কঠোর অকাল মৃত্যু অবলোকন করিতেন, তথাপি প্রাণ থাকিতে তাহা নারকীগণকে সংস্পর্শ করিতে দিতেন না। "রাজ পুতনার জহরব্রতের"কথা মনে হইলে, এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, ভয়ে বিস্ময়ে প্রাণ অভিভূত হইয়া পড়ে।

এই প্রবন্ধটিতে গিরিজাপ্রসন্নের স্বদেশ প্রেমিকতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থ মধ্যে এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে, এগুলি যেমন জাতীয় ভাবের পরিপোষক তেমনি সৎবৃত্তি গুলির পরিস্ফুরক। এইরূপ পুস্তক যত অধিক পঠিত হয়, ততই দেশ মহত্বের শিখরে অধিরোহণ করিতে থাকে। স্ত্রীলোক দিগকে সংসার আশ্রমের উপদেশ প্রদান, গুরুতর দায়ীত্ব পূর্ণ কর্ম্ম, যে সে গ্রন্থকার এইরূপ কর্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া যশঃস্বী হইতে পারেনা। গিরিজাপ্রসন্ন গৃহলক্ষ্মী রচনায় অসাধারণ অভিজ্ঞতা দেখাইয়াছেন, আমরা নিরাপদে-একএক খানি গৃহলক্ষ্মী রমণীগণকে পাঠ করিতে দিয়া যথার্থ ফললাভের আশা করিতে পারি' গ্রন্থকারের ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। গৃহলক্ষ্মীর ভাষা-কলনাদিনী জাহ্নবীর পবিত্র সলিলের ন্যায় বিশুদ্ধ শীতল ও বেগ ময়ী। বঙ্গদেশে গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় একখানি উৎকৃষ্ট স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ যতই আদৃত হইবে, ততই আমরা সমাজ উন্নতির আশা করিয়া উৎফুল্লিত হইতে পারিব।

সহ-সম্পাদক

তটিনীর প্রেম।

সুনীল গগনে শুভ্র শশধর
সুমধুর হেসে ধীরে ভেসে যায়;
রজত-কিরণ যাচি' আলিঙ্গন,
পড়িয়াছে ঢলে তটিনীর গায়;—
আপনার মনে সাগরের পানে
ছুটিছে তটিনী প্রেম-ভিখারিণী,
ভ্রমি কত দেশ, ভুগি কত ক্লেশ,
তবু সাথী আছে আশা কুহকিনী!
সুরভি মলয় বড়ই নিলাজ,
প্রবাহের ছলে চুমে তটিনীরে;
চাঁদের কিরণ বাজে শেলসম
বিরহ-বিধুর-কাতর অন্তরে।
মলয়ের প্রেম, চাঁদের সোহাগ—
বহু নায়িকার নায়ক তাহারা;
তা'তে তটিনীর নাহি অনুরাগ,
সে যে স্বার্থহীন প্রেমে আত্মহারা;—
তার মন-প্রাণ জীবন-যৌবন
সঁপিছে সে কবে সাগরের করে,
মুক্ত-হৃদয়ের অনন্ত উচ্ছ্বাসে
মিশে যাবে সুখে সাগরের নীরে।

শ্রীমাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

স্বপ্নসুন্দরী।

সুশুভ্র-চন্দ্রিকা-দীপ্ত, মধুর যামিনী
যৌবনের ব্রীড়াভরে—হ'য়ে গরবিনী,
লুণ্ঠিত অঞ্চলে যবে, মোহিনী-মায়ায়
মুগ্ধ করে সারা-বিশ্ব, মানব ঘুমায়;
তখন কে তুমি দেবি, অয়ি গো রূপসী,
সুরবালারূপে, উজলিয়া দশদিশি,—
উর গিয়ে বিশ্বরমা, মানস-কাননে;
অলক্তক-রাগ-রক্ত-অতুল চরণে,
মঞ্জুল-মঞ্জরী-ধ্বনি, ধ্বনিয়া হরষে?
মধুমাসে যথা পিক, মধুরে বরষে!
কে তুমি, কে তুমি দেবি, অয়ি সুকল্যাণী,
মাতৃস্নেহে বিথারিয়া নীলাঞ্চলখানি,
মুহূর্ত্তে ত্রিদিব-রাজ্য—দিব্য, সম্মোহন,
নিমীলিত নেত্রপথে, কর গো রচন।
হৃদয় প্লাবিয়া দাও প্রেমের আবেশে,
দৈন্য-ভ্রান্তি-অবসাদ ঘুচা'য়ে নিমেষে?
তোমার পরশ পেয়ে, সুপ্ত-শ্রান্ত-নর
আধি-ব্যাধি ভুলে যায়—হয় গো অমর!
মুহূর্ত্তেক স্বর্গ-সুখ বেদনা-বিহীন
দীন-শান্তি-দাত্রী তুই, মৃত-সঞ্জীবনী,
ভোগ করে তোর বলে, ওগো একদিন
ব্যথিত জনের শুভ, শ্রেয়সী-জননী।

শ্রীভূপতিচরণ চক্রবর্ত্তী।

শ্যাম।

"ইন্দীবরদলশ্যামম্ ইন্দিরানন্দকন্দলং
বন্দারুজনমন্দারং বন্দেঽহং যদুনন্দনং ॥"

'শ্যাম' শব্দে অনেকগুলি বর্ণ বুঝায়। আমরা বলি "নবঘনশ্যাম" "নবদূর্ব্বাদলশ্যাম", কিন্তু চিত্রকরে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি কালো বা নীলবর্ণে চিত্রিত করে; কোথাও সবুজবর্ণের শ্রীকৃষ্ণ আছে জানি না,—সচরাচর আমরা কালো বা নীলবর্ণেরই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতে পাই। ঘাসের বর্ণ সবুজ,—আমাদের কবি শ্রীরামচন্দ্রের বর্ণ "নবদূর্ব্বাদলশ্যাম" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা হউক,'শ্যাম'শব্দে আমরা মোটামুটি তিনটি বর্ণ বুঝি,—কালো, নীল এবং সবুজ।

কবিত্বের পরিপূর্ণতাই প্রেম—এবং এই প্রেমকেই একমাত্র ঐশীশক্তি বলিয়া ভাবিয়া লওয়া যাইতে পারে। কবি দেখিলেন যে, "কালো রূপে জগত আলো"; জগতের আদিতে এবং অন্তে অন্ধকার—সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্ধকার, আবার মহাপ্রলয়ের দিনেও অন্ধকার—চারিদিকেই অন্ধকারের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে কবি আর থাকিতে না পারিয়া আনন্দে গাহিয়া উঠিলেন,—"তাই কালোরূপ ভালবাসি।"

* বিশাল নীল বারিধি ও অনন্ত আকাশের নীলবর্ণ দেখিয়া জয়দেব নিজের দেবতাকে বর্ণনা করিলেন,—"চন্দন-চর্চ্চিত-নীল-কলেবর পীত-বসন-বনমালী।" বনচারী, প্রকৃতির শ্যাম অঙ্কে লালিত বাল্মিকী বনভূমির শ্যাম সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া তাহার দেবতাকে বলিলেন,—"নবদূর্ব্বাদলশ্যাম"

* আবার স্বচ্ছ সমুদ্রের নীল আভায় তন্ময় হইয়া বায়রণ বলিলেন,—

"Thou glorious mirror, where the Almighty's form
Glasses itself in tempest in all time.
Calm or convulsed—in breeze, or gale or storm,
Icing the pole or in the Torrid clime
Dark heaving—boundless, endless and sublime
The image of eternity of the throne of the invisible.

আরও দেখ,—যখন পর্ব্বতের উপরে উঠা যায়, তখন শিখর হইতে ভূমির দিকে চাহিলে অন্য কোনও বর্ণ অপেক্ষা নগ্ন-প্রকৃতির শ্যাম-সৌন্দর্য্যই নয়নকে আকুলিত করে—দূর হইতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দেখা যায় যে, পর্ব্বত শ্যাম বর্ণ, আকাশ শ্যামবর্ণ, সমুদ্র শ্যামবর্ণ—যাহা কিছু অসীম ও অনন্ত তাহাই শ্যাম; সুতরাং ভক্তকবি পুরুষ ও প্রকৃতিকে শ্যাম ও শ্যামা নাম দিলেন। বাস্তবিক সমস্ত বর্ণ অপেক্ষা শ্যামবর্ণই স্নিগ্ধ ও নয়নের প্রীতিকর।

একবার পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছিলাম; যত উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম—ততই প্রস্রবণ-ভূষিত, বনরাজি শোভিত অসংখ্য শিখরগুলি নয়নগোচর হইতে লাগিল; বোধ হইল যেন আমি তরঙ্গময় সমুদ্র-বক্ষে দাঁড়াইয়া আছি—যে দিকেই চাহি কেবল কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রান্তর পর্য্যন্ত শ্যাম সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া পড়িতেছে; তখন ভাবিয়াছিলাম জগতে শ্যামবর্ণ ব্যতীত বুঝি অন্য কোনো বর্ণ নাই।

আবার যখন ভাবি যে শ্যাম নিকুঞ্জে শ্যাম তমালে বসন্তের শ্যাম অনুচর কুহু কুহু গান করিতেছে—যখন ভাবি শ্যাম—কালিন্দীকূলে শ্যাম-পুচ্ছ বিস্তার করিয়া শ্যাম শিখী নৃত্য করিতেছে—আর সেই শ্যাম সুষমার মধ্যে ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম সুঠাম সুন্দর কলবেণুবাদনপর শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন—তখন সব ভুলিয়া বলিতে ইচ্ছা করে।

শ্যাম শ্যাম শ্যাম
শ্যাম নাম জপই
ছার তনু করিব বিনাশ।

শ্রীনফরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মনোরমা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আজ দুইদিন হইল নবেন বাবু কলিকাতা হইতে বাটী ফিরিয়াছেন এবং পুত্রের বিবাহের জন্য এক পাত্রী-স্থির করিয়া আসিযাছেন ও আগামী বৈশাখ মাসে বিবাহ দিতে অঙ্গীকাব করিয়াছেন।

কর্ত্তা বাটীব মধ্যে আসিয়াছেন দেখিয়া গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি যা বলেছিলুম তাব কি হ'ল।"

"কিসেব কথা বলছ।"

"মনোব পবিচয় পেযেছ কি?"

"পবিচয এক বকম পাওয়া গেছে, যে সে সদবংশজাত বটে, কিন্তু,—

"কিন্তু কি'—

উহার সহিত বিবাহ দিতে আমাব অসন্মতি আছে।"

"তার অপরাধ।"

"তাব আর অপবাধ কি।"

"তবে তোমার অমতেব কাবণ কি?"

"শুনলুম ওব মা সুতা কাট্‌ত, তাতেই ওদের চল্‌ত, তা-তুমি কি বল, ওর সঙ্গে ছেলের বে' দিব।

"দেখ কষ্টে পড়লে মানুষ সবই করতে পারে, তাতে তো আমি দোষ দেখতে পাই না, সুতা কাটা তো আর কোন মন্দ কাজ নয়। ঈশ্বর না করুন, হয়ত আমাদের এমন সময় আসতে পারে যে, আমাদেরও তাই করতে হবে।"

"তাব আর আশ্চর্য্য কি।"

"তবে জেনে শুনে অমত করছ কেন?"

'দশজনে বারণ করছে, আর আমি যে মেযেটি দেখে এসেছি, তার কাছে মনো কিছুই নয।"

"হ'তে পারে, কিন্তু এখন ছেলেটির ভাল মন্দর দিকে চাইতে হবে—ত।"

"আমি দেখে শুনে ছেলের বিবাহ দিব, এতে আর ভাল মন্দ কি?"

"না থাকলে বল্‌ব কেন।"

"বকমটী কি, ভেঙ্গেই বল না।"

"আজ কদিন থেকে আমি বতিনেব যে বকম মনের ভাব দেখিতেছি, তাতে বোধ হ'ল, সে মনোবমার বিশেষ অনুরাগী।"

"তুমি আশ্চর্য্য করলে যে।"

"আজ-কালকাব ছেলেদের ওই রকমই হয়ে থাকে, কলকেতায় বেখে লেখা পড়া শেখানব ঐ-গুণ। ওরা তোমার একহাত ঘোমটা দেওয়া কলা-বউ বিবাহ করতে ইচ্ছে করে না, এখন কি আর সেদিন আছে যে বাপ মা যা দেখে দেবে, তাই হবে।"

"এ বড় মন্দ কথা নয়, আমি বাপ এখনও বসে আছি, এরি মধ্যে এত, না জানি অবর্ত্তমানে কি হবে।"

"সে যা হবার হবে, আমরা ত দেখতে আসব না, এখন যা ভাল বিবেচনা হয় কর। তা না হলে হিতে বিপরীত হবে, হয়ত মনের দুঃখে কোথাও চলে যাবে, বা কিছু করে বসবে, আমাদের ঐ একটী বৈত নয়, তা যেমন কাজ করেছিলে তার ফল ভোগ কর। আমি সেই সময়েই বলিয়াছিলাম, যে যতিনকে কলিকাতায় পাঠান হবে না। বাড়ীতে মাষ্টার রেখে পড়াও।"

তখন কি জানিতাম এতদূর হবে। আমার যেমন পোড়া অদৃষ্ট, একটী—ছেলে, সেও বশীভূত নয়, তা ভগবানের মনে যা আছে হবে। আমি বাধা দিয়ে দোষী হ'ব না।"

—•—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আজ হরিহর পুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই আনন্দ সাগরে ভাসমান, কারণ জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মিত্রের একমাত্র পুত্র যতিন বাবুর বিবাহ। আত্মীয় কুটুম্বিনীতে বাড়ী সরগরম। কোথায় যুবতীদল বাসর ঘরে বরের সহিত কিরূপ ভাবে পরিহাস করিবেন তাহা স্থির করিতেছেন, কেহবা বরের সামনে কি গান গাহিবেন—তাহার দুই একটী কলি সঙ্গিনীকে শুনাইয়া পরিতৃপ্ত করিতেছেন। কেহবা নিজ শিশুপুত্রের ক্রন্দনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাহাকে উত্তম মধ্যম শিক্ষা দিতেছেন। কোন যুবতী বঁটীরূপ মহা অস্ত্র দ্বারা চামুণ্ডা রূপে মৎস্যকুলের প্রাণবধ করিয়া হাস্য করিতেছেন। গৃহিণী নিমন্ত্রিত রমণীগণের কাহার কি প্রয়োজন তাহার তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন ইত্যাদি যে যাহার কর্ম্মে ব্যস্ত। নজবৎখানায় বেহাগ রাগিণীতে নজবৎ বাজিতেছে। আজ মিত্রবাটী পুষ্প পতাকা ও অলোক মালায় মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে।

সময় কাহারও অপেক্ষা করে না দেখিতে দেখিতে লগ্ন উপস্থিত হইল। পুরোহিত মহাশয় কতকগুলা মন্ত্র পড়িয়া দুইটী জীবন চিরতরে এক করিয়া দিলেন।

বাসর ঘর যুবতীতে পূর্ণ। পাড়ার মেয়েরা বাসর জাগিতে আসিয়াছে। সকলেই বরের সহিত হাস্য পরিহাসে নিমগ্ন, বাস্তবিক বাঙ্গালা দেশে পর-স্ত্রীর সহিত পরপুরুষের মিলনের এমন দিনের ন্যায় দিন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দিনে কেহ কাহাকে নিবারণ করে না এবং লজ্জা সরম তাহারা সমস্ত পরিত্যাগ করে।

বলা বাহুল্য বর বেচারা হেঁটমুখে বসিয়া আছে। কোন যুবতী সুবর্ণবলয়যুক্ত হাত দুখানি বরের মুখের নিকট লইয়া স্বীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় স্বরূপ তাঁহার গণ্ডে মৃদু করস্পর্শ করিতেছেন, কেহবা কর্ণস্পর্শ সুখ অনুভব করিতেছে। বসুবাটীর বিমলা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, সে এইবার বলিল, কেমন ভাই বর, কনে পছন্দ হয়েছে তো। মিত্তির গিন্নি বলিলেন, তাই যদি না হয় তাতে আর কে কি করবে বল, দেখে শুনে বিয়ে করেছেন এখন না হলেই বা চলবে কেন ? এইরূপে যুবতীগণ হাস্য পরিহাসে নিমগ্ন।

দত্ত বাড়ীর চপলা এইবার ধরিয়া বসিল ; বরকে একটী গান গাহিতে হবে ; সকলেই তাহার কথায় অনুমোদন করিল। বর বলিল অগ্রে আপনি গান, তারপর আমি গাইব ; এইবার চপলা বিষম দায়ে ঠেকিল। তখন সকলেই ধরিয়া বসিল যে ও লুকিয়ে২ গান গায়, আজ বরের সামনে গাইতে হবে। প্রথমে সুন্দরী অস্বীকৃত হইল, শেষে সকলের অনুরোধে গাহিল :—

"দেখ সখা ভুল করে ভাল বেসনা!
আমি ভালবাসি বলে কাছে এসনা।
তুমি যাহে সুখী হও, তাই কর সখা,
আমি সুখী হব বলে হেঁসনা।
আপন বিরহ লয়ে আমি আছি ভাল,
কি হবে চির আঁধারে নিমিষের আলো।
আশা ছেড়ে ভেসে যাই, যা হবার হবে তাই,
আমার অদৃষ্টস্রোতে তুমি ভেসনা।"

এইবার চপলার সুখ্যাতি আর ধরে না, আজ চপলার আনন্দ দেখে কে। যৌবন-গর্ব্বিতা কামিনী বলিল, আমি তো গাইলাম, এইবার বর একটী গাক্, আর না গাহিলে চলে না, সুতরাং বর গাহিল ঃ—

"ওই কথা বল সখি, বল আর বার,
ভালবাস মোরে তাহা বল বার বার।
কতবার শুনিয়াছি, তবুও আবার যাচি,
ভালবাস মোরে তাহা বলগো আবার।"

সুন্দরী যুবতীগণ এবার মনের মত উত্তর পাইয়া মনে মনে বরকে খুব তারিফ করিলেন। সুখের নিশি ভোর হইল, যুবতীগণ সারারাতি রসালাপের পর স্ব স্ব আবাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রভাতে দিনমণী পূর্ব্বকাশ রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া নবদম্পতীর মঙ্গল কামনা করিতে ২ উদিত হইলেন। বলিতে ভুল করিয়াছি, নরেন বাবুর অন্য বাটীতে কন্যাকে লইয়া গিয়া তথায় বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল। কারণ এক বাড়ীতে তত আমোদ হইতে পারে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

ফাল্গুন মাস; সন্ধ্যা হইয়াছে! দুই একটী করিয়া অসংখ্য নক্ষত্র রাজি নীল নভোমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিল। কুমুদিনীবল্লভ শশধর তারা হারে সজ্জিত হইয়া স্বীয় স্নিগ্ধ সুবিমল কিরণে জগত উদ্ভাসিত করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে এক অভিনব সালঙ্কারা যুবতী শিশুপুত্রের অঙ্গুলি ধারণ পূর্ব্বক নরেন বাবুর অট্টালিকার ছাদে বসিয়া বলিতে ছিলেনঃ—

"আচ্ছা খোকা বল দেখি চাঁদ সুন্দর, কি আমি সুন্দর।"

খোকা বলিল তুমি্।

"মিথ্যা কথা, চাঁদ সুন্দর!"

খোকা বলিল—মি-থ্যা ক-থা!

সুন্দরী—ঈষৎ হাস্য সহকারে খোকার মুখ চুম্বন করিলেন।

এমন সময় খোকা বলিয়া উঠিল, "বাবা এসেচে"।

"বলি কতক্ষণ।"

"তুমি যতক্ষণ।"

"আমি খোকাকে নিয়ে একটু আদর করছিলুম, তোমার অমনি হিংসা হোল, তাই দৌড়ে এসেছ।"

"আমি কি খোকার কেউ নয়।"

"আচ্ছা, পরীক্ষা করা যাক।"

"এস খোকা, আমার কোলে এস।"

"খোকা মুখ ভার করিল।"

"দেখলে, খোকা কাকে ভালবাসে।"

'খোকা নাই বাসুক, তুমি খোকার মা তুমি বাসলেই হ'ল বলিয়া সুন্দরীর মুখচুম্বন করিলেন ও গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

পাঠক। বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন ইঁহারা কে? ইঁহারা আর কেহ নয় আপনাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত 'মনোরমা" ও তাঁহার স্বামী "যতীনবাবু"। ঈশ্বরানুগ্রহে মনোরমা ভালবাসার প্রতিদান স্বরূপ স্বামীর ক্রোড়ে নবকুমার প্রদান করিয়া ধন্য হইয়াছে

শ্রীনং৽

বিজন-বাস।

স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য মাখা
বিজন কানন,
বিমল সৌন্দর্য্যে তাহা
সতত মগন।
বিহ্বল সদত হিয়া
সন্দর্শনে গুণ,
সেথা অতি ভাল, হ'তে
সংসার বন্ধন।
হেথা নাই বাক্য জ্বালা
গৃহেতে যেমন,
অহরহ প্রাণ মন
যাহে জ্বালাতন।
হেথাকার বৃক্ষ লতা,
সুস্নিগ্ধ পবন,
শান্ত করে অনুক্ষণ
উচাটন মন।
হেথাকার বিহঙ্গম,
সুমধুর তানে,
মাতায় শ্রোতার মন,
বহে শান্তি প্রাণে।
ক্ষণিকের তরে হেথা,
নহে শান্তি,—হীন,
এবিজন বাস তাই—
শান্তিতে প্রবীন।

শ্রীললিত রঞ্জন সমদ্দার।

আমার অদৃষ্ট লিপি।*

চিনে না আমারে কেহ, শুনা নাহি যায়
আমার যশের গীতি কারো রসনায়।
রচি নাই গদ্য পদ্য, নহি গ্রন্থকার,—
কাব্যে বা সাহিত্যে মম নাহি অধিকার!
সমাজে নেতৃত্ব কভু করিনি গ্রহণ,—
ওজস্বী-বাগ্মিতা-বলে করি সচেতন
নিদ্রিত স্বদেশে দৃঢ়-উন্নতির পথে
অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করি দিইনি কখন।
বিশাল জগৎ মাঝে আমি ক্ষুদ্রতর
তথাপি ব্যাকুল সদা আমার অন্তর
তোমা সবাকার সাথে মিশিবার তরে
সেবিতে মানবে, বিশ্বে ক্ষুদ্র শক্তি ভরে।
ক্ষুদ্র প্রাণ আমি হায়! সদা অবনত
তোমাদের সমুন্নত মহত্ত্বের কাছে।
তোমাদের সুবিশাল হৃদয়ের মাঝে
কি নিভৃত মহাশক্তি আছে লুক্কাইত
পাইনা দেখিতে আমি, কোন্ শক্তি বলে
তোমরা আরাধ্য বিশ্বে, আমি নরাধম।
তোমাদের জ্ঞান-জ্যোতিঃ নয়ন আমার
ধাঁধিয়া নিমেষ মধ্যে করে অন্ধকার;
বিপুল এ কর্ম্মক্ষেত্রে নাহি দেখি পথ
দৃষ্টি-হীন শক্তি-হীন ভগ্ন মনোরথ।

*এই কবিতাটী প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে রচিত। লেখক।

জগতের অজানিত নিভৃত নির্জ্জনে
থাকি আমি, লক্ষ্য কেহ করে না আমায
তোমাদের গৌরবের উজ্জ্বল আভায়
আলোকিত ধরাতল, সুখী আমি মনে
দুন্দুভির ধ্বনি শুনি আকুল পরাণ,
অশ্রুবারি বয়ে যায় নয়নে আমার
জগতের কার্য্যক্ষেত্রে অনন্ত বিস্তার
কর্ম্মফলে আমি তথা পশ্চাতে সবার।
সৈনিক তোমরা সবে জীবন সংগ্রামে,
সুচতুর মন্ত্রী কেহ, কেহ সেনাপতি,
আমি ক্ষুদ্র, তোমাদের শিবিরের সাথী।
ওগো, যেওনা তোমরা মোরে ফেলিয়া পশ্চাতে
ডেকে নও সাথে সাথে করুণা করিয়া,
তোমা সবাকার কবি পদাঙ্ক শরণ
আমার অদৃষ্ট-লিপি হইবে খণ্ডণ।
ওগো, মনঃ মাঝে এযে হাহাকার ধ্বনি
বিদারিয়া অন্তঃস্থল উঠিছে নিয়ত,
আকাঙ্খার অনিবার কাতর মিনতি
এ নহে আপন তরে, সেবিতে জগতে
ব্যাকুল আমার প্রাণ, কিন্তু হায়, আমি
ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর, অতি দীন হীন,
ইচ্ছাবিচলিত চিত্তে শকতি-বিহীন।
ওগো, যেওনা তোমরা মোরে ফেলিয়া পশ্চাতে,
ডেকে লও সাথে সাথে করুণা করিয়া,
তোমা সবাকার কবি পদাঙ্ক শরণ
আমার অদৃষ্ট-লিপি হউক্ খণ্ডন।

শ্রীনবীন চন্দ্র দত্ত, সি, এস্।

"মা"

১

জগত-জোড়া মা আমার ;—
যাঁর গায়ে ঝলমল, করিতেছে ধরাতল,
গিরি গুহা উপবন, রবি শশী তারাগণ,
ঊর্দ্ধে নভঃ নিম্নে পারাবার ;
উদ্ভাসিত দেখিতেছি সবই রূপে মার॥

২

রূপেতে খেলিছে দেখ মার,
বিজলি মেঘের কোলে, মধুর হাঁসিটি গালে,
শিশুদের ; আহামরি ! কি শোভা বাহার।
রামধনু কালে বরষার !
কমলিনী সরোবরে, শোভে জল আলো ক'রে,
পে'য়ে রূপ কণা মাত্র তাঁর॥

৩

অস্তিত্ব সর্ব্বত্র হেরি মার ;—
অনলে অনিলে জলে, লতা পাতা ফুল ফলে,
ব্যাপিয়া, পাষাণে জড়িতাকার।
অমৃতে গরলে শঠে কি সরলে,-সর্ব্বঘটে,
অবলা পুরুষে ক্লীবে আছে স্থিতি মার ;—
সবেতে আছেন মাতা, সব্ই কোলে তাঁর ;
পূত বা অপূত সব্ই মার॥

৪

ভোলা মন ! শু'যে কোলে মার,
রত আছ স্তন্য পানে, নাহি চাও তাঁরি পানে ;
চোখ্ মুদে আছ ভুলে, তন্দ্রাঘোরে না দেখিলে•
রূপ্টি জগত-জোড়া তাঁর।
ঘুম্ পড়াচ্ছেন্ জীবে হাত বুলায়ে তাঁহার।
চোখ্ মে'লে মুখ্ তু'লে দেখ একবার
ভুবন-মোহন রূপ মার॥

মাতৃ-প্রাণ ছেলে যারা মার ;
চোখ্ মেলে তাঁরে চায়, 'মা মা' ক'রে ডাকে হায়,
চুমিয়ে কপোল তার, আদরে মা বারে বার
স্নেহে বুকে ধরি আপনার ;

আনন্দ উথলে মনে দেখিয়া অপার
ভুবন-মোহন রূপে যার ॥

৬

যে রূপে দেখিতে চায় তাঁর,
নিরাকার জ্যোতি মাঝে, সাকারে মা সেই সাজে
মাতা প্রভু ছেলে সখা, হয়ে তিনি দেন দেখা,
স্নেহে বিদূরিত ক'রে অজ্ঞানান্ধকার,
ভুবন-মোহন রূপে যার ॥

৭

দেখিবারে রূপ তুমি তাঁর,
হায়! তুমি চা'লে কই, ডাকার মত ডাকলে কই।
মুখে বল চাও তাঁরে, বিষয়-স্তম্ভ নিয়ে প'রে
আছ, মুখ দেখিলে না যার!
যাহা চা'ণ তাহা পেলে, হায়! তব কর্ম্মফলে
ঘুম ঘোরে কাছে তুমি যার ॥

মন! একি তব ব্যবহার ॥
চোখ্ মেলে ডাকিলেনা যাকে একবার,
নিশ্চয় শোচিতে হবে জানিও তোমার।
তন্দ্রা ছে'ড়ে মুখ্ তু'লে দেখ একবার
ভুবন-মোহন রূপ যার ॥

শ্রীজগদ্বন্ধু চৌধুরী।

অদ্ভূত হত্যা-কাহিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতেবপর।)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অপহরণের মন্ত্রণা।

সূর্য্যদেব দিবস-রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, এক্ষণে তদীয় স্থানে রজনী দেবী তামসবস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া উপবেশন করিলেন। গৃহস্থ কামিনীগণ দিবসের কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক অপরূপ বেশ বিন্যাসে নিযুক্ত হইল, ক্রমে দুই একটী করিয়া হীরকখণ্ডরূপ তারকামালা নীলাকাশে উদিত হইয়া প্রাণপতি চন্দ্রের আগমন পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে নিশানাথ হাসিতে হাসিতে সুনীল নভমণ্ডলে দর্শন দিলেন! সরোবরে কুমুদিনী বিকশিত হইয়া হাসি হাসি মুখে প্রাণপতি চন্দ্রের সহিত প্রেমালাপ করিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে তরুলতাদি সূর্য্যোত্তাপে নিস্তেজ হইয়াছিল, এক্ষণে সায়ংকালীন সুস্নিগ্ধ সমীরণ স্পর্শে পুনরায় নবীভূত হইয়া প্রফুল্ল মনে মস্তক সঞ্চালন করিতে লাগিল। যে সকল কুসুমনিচয় দিবাবসানে বিকসিত হইয়া থাকে, তাহারা বায়ুভরে দুলিতে দুলিতে চতুর্দ্দিকে সৌরভ বিস্তার করিতে লাগিল! আহা! হতভাগ্য কেরাণীবর্গ সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর আপন আপন গোলামগিরির কার্য্য-ক্ষেত্র হইতে পিতৃমাতৃহীন অনাথের ন্যায় বিষণ্ণ বিশুষ্ক বদনে মৃত প্রায় হইয়া আপন আপন গৃহাভিমুখে গমন করিতেছে। বন্ধু বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। এমন সময়ে মালতীমালা একাকিনী উদ্যান মধ্যে জ্যোৎস্না-বিধৌত বাঁধান বকুল তলায়

উপবেশন করিয়া (জ্যোৎস্নালোকে) প্রকৃতির মনোরম শোভা নিরীক্ষণ করিতেছে। এবং আপন মনে গুণ গুণ করিয়া মিহিসুরে গান করিতেছে। এদিকে সুরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে মালতীমালার পার্শে আগমন করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। সুরেন্দ্রনাথের পদশব্দে মালতীর গান গাওয়ায় বাধা পড়িল, সে সুরেন্দ্রনাথকে পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া লজ্জিত হইল. শশব্যস্তে অঙ্গের যথাস্থানে বসন সমর্পন করিয়া, বলিল, আমি তোমার আশায় বসিয়া আছি, তুমি কখন এলে?

সুরেন্দ্র। এই মাত্র আসিয়াছি। দেখ তোমার চোকে জল কেন, তুমি কি কাঁদছিলে? মালতী লজ্জা পাইয়া বলিল—কই না!

সুরেন্দ্র। আমি তোমাব গান শুনেছি। কিন্তু,মৃদু কান্না মিশ্রিত বলে বুঝতে পাবি নাই। মালতী, তুমি অমন করুণ স্বরে কি গান গাচ্ছিলে!

মালতী। তা আমি জানিনা! সুরেন্দ্রনাথ—তাহাব এরূপ অবস্থা দেখিয়া বিদ্রূপচ্ছলে বলিলেন, দেখ মালতী, তোমাকে কয়টি খুব কাজের কথা জিজ্ঞাসা করবো। তুমি বালিকা হ'লেও অতি বুদ্ধিমতী,ভেবে চিন্তে উত্তর দিও। সুরেন্দ্রনাথের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া মালতীমালা আর হাস্যসম্বরণ করিতে পারিল না, হাসিয়া বলিল,—কি, সুরেন্দ্র নাথ বলিল,—মালতি। তোমার পিতা মাতা ঠিক করিয়াছেন,—আমাব সহিত তোমাব বিবাহ দিবেন। মালতী শুনিয়া বয়স সুলভ লজ্জায় মুখাবনত করিল। সুরেন্দ্রনাথ পুনরায় বলিল, তোমার যদি আমায় বিয়ে কর্ত্তে কোন আপত্তি থাকে, তা আমার নিকট প্রকাশ করে বল, আমি তা হলে এ বিয়েতে রাজি না হয়ে তোমার জন্ত আর একটা পচ্ছন্দ সই বর আনিয়া দিব।

মালতী। তোমায় আর কষ্ট করিয়া পচ্ছন্দসই বর আনিতে হইবে না, বাবা আমার সহিত যার বিয়ে দিবেন, সেই আমার বর হ,বে তুমি সেদিনও বিয়ের কথা বলছিলে, আবার আজও বলছ, একথা তোমার সঙ্গে আমার রোজ রোজ আলোচনা করিতে লজ্জা হয়। তোমার কি এ সকল কথা কহিতে একটুও লজ্জা হয় না?

সুরেন্দ্র। লজ্জা? মালতী!—আমার লজ্জা হয় না।

মালতী। দেখ, তুমি যে আমায় খুব ভালবাস—তা আমি জানি।

সুরেন্দ্র। কেমন করে?

মালতী। তা আমি তোমার কাছে বলবোনা।

সুরেন্দ্র। আমি তোমায় ভালবাসিনা।

মালতী। মিথ্যাকথা। সেই দিন আমার জ্বর হযেছিল, দেখে তুমি আমার জন্য কত কাঁদছিলে, আর ঈশ্বরের কাছে বলছিলে,—হে ঈশ্বব আমাব প্রাণের মালতীকে ভাল করে দেও। তুমি মনে করেছিলে আমি ঘুমিয়েছি, কিন্তু আমিত ঘুমুই নি, আমি জেগেছিলাম, সব শুনেছি। আব একদিন তোমার ডায়েরী-বুক চুরি কবে পড়তে পড়তে এক স্থানে লেখা রয়েছে দেখলাম,—মালতীমালা বিনা হৃদয় শূন্য, তাকে ব্যতীত জীবনে আর কাকেও বিয়ে করবো না, এ হৃদয তার, তার হৃদয়ে আর কাকেও বসতে দিবনা। তা একথা আমি শুনবো কেন?

সুরেন্দ্র। তবে তোমায় ভালবাসি। তুমি তবে আমায় বিযে কর্ত্তে প্রস্তুত আছ, কেমন?

মালতী। কি জানি আমি জানিনা। তুমি কিন্তু নিতান্তই বেহায়া, ছি! সুরেন্দ্র নাথ তখন হাসিয়া বলিল, তবে কাঁদছিলে কেন? মালতীমালা বলিল,—আমি জানিনা। সুরেন্দ্র নাথ বলিল,—আমি জানি যে তুমি আমাকে

খুব ভালবাস, তাই আমায় না দেখে কাঁদছিলে। আমি তোমাকে লইয়া সংসারে স্বর্গ রচনা করিতে পারিব।

মালতী। ছি! তুমি বড় লজ্জাহীন, তোমাকেত বহুদিন বলেছি আমি তোমার তবে আর বার বার লজ্জা দাও কেন? তুমিই যে আমার ঈশ্বর, তুমিই যে আমার হৃদয়েশ্বর, তোমা বিহনে যে আমি বিধবা। (চন্দ্রের অনেক কুমুদিনী আছে,কিন্তু কুমুদিনীর অনেক চন্দ্র নাই সেইরূপ আমার একমাত্র 'উপাস্য দেবতা তুমি' তোমা বিহনে আমি যে পতিহীনা। মালতীমালার কথা শুনিয়া সুরেন্দ্র নাথ গদ গদ কণ্ঠে কহিল—মালতি! তুমি বালিকা, তুমি জাননা যে আমি তোমায় কত অধিক ভালবাসি। আমার হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে তোমার ঐ আনন্দময়ী প্রতিমাকে চির অধিষ্ঠাত্রীদেবীরূপে স্থাপিত করিয়াছে; কিন্তু আমি জানিতাম না, তোমার বালিকা-হৃদয়ের ভালবাসা এতদূর গভীর হইয়াছে। আমাকে ক্ষমা করিও' আমি ঠাট্টাচ্ছলে তোমাকে এত কথা লিখিয়াছি। আমি তোমাকে যে কিরূপ ভালবাসি তাহা যদি দেখাইবার হইত, তবে হনুমানের ন্যায় বুক চিরে দেখাইতাম।

মাল। তোমাকে অত কথা বলতে হবে না, আর আমাকে লজ্জা দিওনা। দেখ তোমায় না দেখে আমি থাকতে পারি নে। তোমায় আবার কবে কলিকাতায় যেতে হবে?

সুরেন্দ্র। আমাদের মেডিকেল কলেজের ছুটী ত অনেকদিন নয়। এই বিজয়া দশমীর ৪।৫ দিন পরে কলেজ খুলিবে। বোধ হয় আর ৭।৮ দিন পরে কলিকাতায় যেতে হবে।

মালতী। আমায় কলিকাতায় গিয়ে সপ্তাহে সপ্তাহে চিঠি দিতে হবে।

সুরেন্দ্র। সে আবার মনে করে দিতে হয়? নিশ্চয় দেব।

মালতী। আচ্ছা দেখা যাবে। এখন চল ঘরে যাই. রাতও অনেক হয়েছে। এই বলিয়া উভয়ে আপন আপন গৃহাভিমুখে গমন করিল। সুরেন্দ্র নাথ কিছুদিন স্বগ্রাম কাননপুর অবস্থানের পর পুনরায় পাঠের জন্য মালতীর নিকট হইতে প্রণয়ের চিহ্ন স্বরূপ একটী চুম্বন পারিতোষিক গ্রহণ করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিল। মালতী মালার সহিত কথা রহিল, সপ্তাহে সপ্তাহে পত্র দিবে।

সুরেন্দ্র নাথ কলিকাতা গমন করাতে সুযোগ বুঝিয়া একদিন ভীষণ ক্ষেত্রমনিকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিল, তোমাকে ১০৲ টী টাকা দিব, তুমি মালতীকে চুরি করিবার সুযোগ করিয়া দাও' ক্ষেত্রী বলিল, এ কার্য্য আমাদ্বারা কখনই হইবে না।

ভীষ। কুচ পরাওয়া নাই। ১৫৲টাকা নেও?

ক্ষেত্র। না, আমি পারিব না, আপনি এ আশা ত্যাগ করুন।

ভীষ। ১৫৲টাকা ছেড়ে ২০টাকা নেও. কুড়ি ছেড়ে ৪০টাকা নেও, তবুও কি দয়া করিবে না? ভীষণের আশা ব্যর্থ হইল না। ঝীর মন নরম হইল, সে সম্মত হইয়া বলিল, নগদ টাকা চাই?

ভীষ। এই কুড়ি টাকা নেও, বাকী,কার্য্যোদ্ধার হইলে দিব। এই বলিয়া ভীষণ ঝীর হস্তে কুড়ি টাকা প্রদান করিল, ঝী হাতে এতগুলি নগদ টাকা পাইয়া, ভাবিল, "মাছ ধরতে জাল ফেললাম, উঠলো মহামূল্য মাণিক," তৎক্ষণাৎ সে আত্ম সংযম করিয়া বলিল, আমি কাল সন্ধ্যার সময় মালতীকে সঙ্গে করিয়া ফুল বাগানের উত্তর পার্শ্বে বনের ধারে এসে বসবো, তুমি ঠিক হয়ে থেকো। আমি সঙ্কেত করিবা মাত্র তোমরা তাকে যে কোন উপায়ে ধরে নিয়ে যেও। আর এক কথা এ কথা যেন কাহারও নিকট প্রকাশ না হয়।

ভীষ। আরে রাম বল, সেও কি কখনও হয়! দেখিস আমার কাজ যেন উদ্ধার হয়, এ যে সেলোকের টাকা নয় তা জানিস,এ টাকা তোর ফাঁকি দিয়ে হজম করা বড় সহজ নয়। এই বলিয়া সেদিনকার মত ভীষণ চলিযা গেল।

পর দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে খেতী মালতীকে বলিল. চলদিদি। বাগানে বেড়াতে যাই। সরলচিত্ত মালতী খেতীর বাক্যে কোন প্রকার সন্দেহ না করিয়া এবং সুরেন্দ্র নাথের বিরহ অপনোদন করিবার মানসে পুষ্পোদ্যানে চলিল ঝী জিজ্ঞাসা করিল,—তোমাকে কে এমন মনমোহিনী রূপ দিলে ভাই?

মাল। তা আমি কি করিয়া জানিব?

ঝী। তোমাকে সকলের অধিক কে ভালবাসে ভাই?

মাল। তা আমি কেমন করিযা বলিব? কথা শুনিযা ঝী মৌন হইয়া রহিল। মালতী বলিল এইবার আমাব পালা?

ঝী। কি বলবে ভাই বল?

মাল। তোমার স্বামী কে ভাই? আমরা ত তোমার স্বামীকে দেখিতে পাইনা? অথচ তোমার হাতে নোয়া, সীমন্তে সিন্দুর আছে। ঝী সে কথা চাপা দিয়া বলিল,—সুরেন্দ্র বাবু তোমাতে অনুরক্ত হইয়াছেন।

মাল। তা আমি কি করিব?

ঝী। তোমার তাতে অভিলাষ আছে. আশক্তি আছে? মালতী লজ্জা পাইয়া অবনত মুখে বলিল দুর পাগলী! এই সকল কথা বার্ত্তার কিছুক্ষণ পরে খেতী সঙ্কেত করিল,অমনি দস্যুরা বৃক্ষান্তরাল হইতে বাহিব হইযা মালতীর উপর লাফাইযা পড়িল, পড়িয়াই উগ্রগন্ধশালী ক্লোরাফর্ম্ম দ্বারা তাহাকে অজ্ঞান করিল। মালতী ক্ষীণকণ্ঠে আ—মা—য়—প্রা—ণে—মে—রো—মা —পর্য্যন্ত বলিয়া দস্যুদের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িল। দস্যুরা তাহাকে স্কন্ধে করিযা নিজেদের আড্ডায় লইয়াগেল। তাহাব পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা পাঠক অবগত আছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উদ্ধারের উদ্যোগ।

মালতীর উদ্ধারের জন্য একজন বিচক্ষণ ডিটেক্টিভের প্রয়োজন সকলেই মনে করিলেন,এবং তাঁহারা প্রতাপচাঁদ মজুমদার নামক একজন সুযোগ্য ডিটেক্টিভকে সংবাদ দিলেন। তিনি আসিয়া পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা শুনিয়া দীনেশ বাবুর গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন, তৎপরে দীনেশ বাবুকে বলিলেন,"আচ্ছা, আমার সঙ্গে বাগানে আসুন, সে স্থল পরীক্ষা করিয়া আপনাকে গুটিকতক কথা জিজ্ঞাসা করিব।" তখন উভয়ে উদ্যানে আগমন করিয়া, প্রথমে আলোক দ্বারা সমস্ত উদ্যান মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে এক স্থানে একখানি নূতন ধরণের ছোরা পাওয়া গেল। উহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া প্রতাপ বাবু বলিলেন,—"আপনার কন্যাকে নিশ্চয়ই কেহ হরণ করিয়াছে; কারণ এই ছোরার মধ্যে যে ত্রিশূলের ন্যায় চিহ্ন অঙ্কিত দেখিতেছেন, উহা ডাকাতদের চিহ্ন। ডাকাতরা তান্ত্রিকদের

ন্যায় মা কালীর পূজা করিয়া এই ত্রিশূল অঙ্কিত ছোরা লইয়া ডাকাতি করিতে যায়। আমরা এ পর্য্যন্ত যত দল ডাকাত ধরিয়াছি, তাহাদের সকল দলেরই অস্ত্র শস্ত্রে ত্রিশূলের ন্যায় কোন একটি চিহ্ন অঙ্কিত থাকে। এখন আপনাকে গুটিকতক প্রশ্ন করিতে চাই; যথাযথ উত্তর দিবেন নচেৎ কার্য্যে ব্যাঘাত হইতে পারে। আপনার কন্যাটীকে কোন সময় হইতে দেখিতে পাইতেছেন না?

উত্তর। রাত্রি আন্দাজ ৯॥ টার পর হইতে দেখিতে পাইতেছি না।

প্রশ্ন। তাহাকে অন্বেষণ করিতেছেন কি?

উঃ। সমস্ত স্থানে ও সকল গৃহে তাহার অন্বেষণ করিয়াছি।

প্রঃ। তাহার কি কোন ফটোগ্রাফ আছে?

উঃ। হাঁ তাহার একখানি ফটোগ্রাফ ও আছে।

প্রঃ। ফটোগ্রাফ খানি কি ইতিমধ্যে তোলা হইয়াছে,না অনেক দিন হইল তোলা হইয়াছে?

উঃ। এই কয়মাস হইল সুরেন্দ্র নামক একটী বালক নিজের সঙ্গে মালতীর ফটোগ্রাফ তুলাইয়াছে।

প্রঃ। আপনার কন্যার নাম তবে মালতী?

উঃ। হাঁ।

প্রঃ। মালতীর বয়স কত?

উঃ। তাহার বয়স ১৩।১৪ বৎসর হইবে।

আপনার শত্রু কেহ আছে কি? এবং কন্যাটী বিবাহিতা কি অবিবাহিতা?

শত্রু ত কেহ নাই এবং আছে বলিয়াও স্মরণ হয় না। মেয়েটী কুমারী, আগামী বৈশাখ মাসে তাহার সহিত একটী ছেলের বিবাহ দিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম; ছেলেটী সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ! তাহার পর এইত দুর্ঘটনা। হা ভগবান! এই বলিয়া দীনেশ বাবু একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ডিটেক-টিভ প্রতাপচাঁদ বাবু দেখিলেন, দীনেশ বাবুর নয়ন যুগল অশ্রুতা ক্রান্ত হইয়াছে ও নিদারুণ মানসিক কষ্টে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিয়াছে এই জন্য তিনি আর কথা বলিতে পারিতেছেন না। তখন প্রতাপ বাবু বলিলেন, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনার কন্যাটীকে নিশ্চয় উদ্ধার করিয়া আপনার হস্তে সমর্পণ করিব। প্রতাপ বাবু দীনেশ বাবুর মনে শান্তিবারি সেচনের জন্য উপরোক্ত আশ্বাসপূর্ণ বাক্যগুলি বলিলেন। কিন্তু তিনি মনে মনে ভাবিলেন, বাবা! ডাকাত ধরা বালকের ক্রীড়া নহে! প্রতাপ-চাঁদ বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কন্যাটীকে কি আর কেহ বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল? হয় তো সেই দুরাচার আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইলনা দেখিয়া মালতীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহাই আমার বিশ্বাস আর যদি অলঙ্কারের লোভে চুরি করিত, তবে মুখ বাঁধিয়া জোর করিয়া অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া চলিয়া যাইত।

উঃ। সে কি কথা। বিবাহের জন্য অনে-কেই অনুরোধ করিয়াছিল। মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ অনেক স্থান হইতেই আসিয়াছিল।

প্রঃ। সে কথা হইতেছেনা; কথাটা একটু ভেঙ্গে বলি শুনুন—যদি কেহ বিবাহে নিরাশ হইয়া কোন প্রকার ভয় দেখাইয়া থাকে যে, আমার সহিত মালতীর বিবাহ না দিলে, আপনার ও মালতীর সমূহ বিপদ জানিবেন ইত্যাদি। আমার একথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যত মেয়ে চুরি হয়, তার অধিকাংশ স্থলেই হয় গহনার জন্য, না হয় শত্রুতার জন্য এবং অধিকাংশ স্থলেই মেয়ের রূপের জন্য লোকে মেয়ে হরণ করে।

উঃ। কই, কেহ ভয় দেখাইয়া মালতীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল, এমন কথা ত মনে

পড়ে না তবে যদি কেহ মালতীর অঙ্গের অলঙ্কারের লোভে বা রূপের জন্য তাহাকে হরণ করিয়া থাকে—সে স্বতন্ত্র কথা।

প্রঃ। পুনরায় বিশেষরূপ ভাবিয়া দেখুন কেহ ভয় দেখাইয়া ছিল কিনা, বা আপনার শত্রু কেহ আছে কিনা? দীনেশ বাবু অনেকক্ষণ একাগ্রমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; তৎপরে হটাৎ ব্যগ্রতার সহিত বলিয়া উঠিলেন, হাঁ, হাঁ মনে হইয়াছে শুনুন - আমার জনৈক প্রিয় বন্ধুর ভীষণ নামক পুত্র, বিবাহের জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করে। আমি বলিলাম সুরেন্দ্র হেন ছেলে থাকিতে আর কাহারও সহিত মেয়ের বিবাহ দিব না। তবু ও সে বলিল, মালতীকে আমার হাতে সমর্পণ করুন, তা হলে সে সুখে থাকিবে। আমি বলিলাম, সুখে থাকিবার কথা কি বলিতেছ, আমার মেয়ে সুরেনের কাছে রাজরাণী অপেক্ষাও সুখে থাকিবে। তবুও সে বার বার আমাকে জ্বালাতন করিতে লাগিল। আমি তাহার স্বভাব চরিত্র বিশেষরূপ অবগত ছিলাম, সেজন্য তাহার কথায় অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলাম— ভীষণ। তুমি তোমার স্বভাব চরিত্র জান না? তুমি কোন্ সাহসে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছ? আমি তোমার ন্যায় অসচ্চরিত্রকে কন্যা দান করিব; তুমি এমন অসম্ভব কথাও মনে স্থান দাও? আমার বন্ধুর পুত্র বলিয়া তোমায় কিছু বলিলাম না; তুমি এই মুহূর্ত্তে আমার বাটী হইতে চলিয়া যাও। সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, আপনি আমাকে যেরূপ অপমান করিলেন, আমিও আপনাকে ইহার কিরূপ প্রতিশোধ দিই, তাহা পশ্চাতে জানিতে পারিবেন। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল আমিও ভাবিতে লাগিলাম, ছেলেটার কি সাহস। আচ্ছা প্রতাপচাঁদ বাবু। আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি যদি রাগ না করেন তবে বলিতে পারি। প্রতাপ বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন তা কি জিজ্ঞাসা করিবেন করুন, তাহাতে রাগ আবার করিব কেন? বলুন কি বলিবেন। তীক্ষ্ণদর্শী-প্রতাপবাবু দীনেশবাবুর মনোগত ভাব অনেকটা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন; সজন্য পুনরায় একটু হাসিলেন। সে হাসিতে যতটুকু মধুরতা ছিল তাহা লেখনী বর্ণনা করিতে অক্ষম। তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে, সে হাসির মধ্যে তিরস্কার ব্যঞ্জক চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছিল। দীনেশবাবু তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, আপনি এ সকল বৃথা প্রশ্ন করিয়া কেন যে সময় নষ্ট করিতেছেন, তাহাই বলিতেছি। বলি যতক্ষণ বৃথা সময় নষ্ট করিবেন, ততক্ষণ মালতীর অন্বেষণ করিলে ভাল হয় না কি? রাত্রিত প্রায় ১১টা বাজে।

শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচী। ক্রমশঃ

আবির্ভাব।

মন অবসাদ শত বিপুল গৌরবে
মৌন করি, স্তব্ধ করি, মুখর প্রকৃতি
উপেক্ষিত করি দেব-পুষ্পিত-সৌরভে
জড়তায় বেঁধেছিল যারা বিশ্ব-রীতি।
প্রাণের পুলকরাশি সংযত শাসনে,
বিসর্জ্জিয়া আপনারে ঘৃণায় লজ্জায়,
শূন্যতার রম্য-ক্রোড়ে উদাস-পরাণে
চেয়েছিল স্থিতিটুকু নীরব ভাষায়।

অলক্ষিতে কোথা হতে চিত্র আলোকের
জাগিয়া উঠিল মর্ম্মে সুখদ সুন্দর;—
অবজ্ঞার তলে হিংসা-দ্বেষ জগতের
মৃত্যুরে আনিল ডাকি পরম-নির্ভর।
সুপ্ত,স্মৃতি-বক্ষ তব নূতন-সঙ্গীত
জাগায়ে তুলেছে সখা, প্রভাতে চকিত।

শ্রীভুবন মোহন দত্ত।

কন্যা-বিবাহে পণ।

হিন্দু-সমাজ চিরদিন প্রাতঃস্মরণীয় পরমারাধ্য আর্য্য-ঋষিগণের ব্যবস্থানুসারে পরিচালিত। যে সমাজ এক সময় সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত-কাল পর্য্যন্ত ব্যবস্থাগুরু মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও বশিষ্ঠ আদি মহর্ষিগণের পবিত্র বিধান ও ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিয়া সকল কার্য্য সম্পন্ন করিত আজ সেই সমাজের কি মর্ম্মভেদী শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় সে সমাজে এক্ষণে প্রকৃত নেতা নাই। তথায় প্রতি মুহূর্ত্তে আর্য্য-ঋষিগণের উদার ও মঙ্গলময় ব্যবস্থা উপেক্ষিত ও স্বধর্ম্মানুরাগী পূর্ব্ব-পুরুষ-গণের পবিত্র আচার ব্যবহার অনেক স্থলে পদদলিত হইতেছে। আজ হিন্দু সমাজ নিতান্তই প্রাণহীন বলিয়া বোধ হইতেছে যে সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার দোহাই দিয়া ধনশালী ব্যক্তিগণ যথেচ্ছাচারিতা প্রদর্শনে সমাজে নানা বিশৃঙ্খলতা ও অশান্তি উৎপাদনে উহার অস্থি—পঞ্জর চূর্ণ করিয়া উহার প্রাণের বন্ধন শিথিল করিতে কৃতসঙ্কল্প, সে সমাজ কত দিন সজীব ও সতেজ থাকিতে পারে? শত শত বর্ষের পরাধীনতায় হিন্দুর প্রায় সমস্ত গৌরব বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই দুর্দ্দিনেও কতকগুলি পবিত্র ও উজ্জ্বল আদর্শ হিন্দু সমাজ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই বলিয়া এই ঘোর অধঃপতনের সময় হিন্দু সন্তান নানারূপে লাঞ্ছিত, নিগৃহীত ও বিড়ম্বিত হইয়াও পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতির নিকটে উন্নত মস্তকে স্পর্দ্ধার সহিত আপনার সমুন্নত ও সুপবিত্র সামাজিক প্রথা, পদ্ধতি ও ধর্ম্মভাবপূর্ণ সংস্কারের পরিচয় দানে সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সকল সভ্য জাতির মধ্যে বিবাহ বলিয়া একটা প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু ভারতে হিন্দুর মধ্যে ইহা যেমন পরিস্ফুট এবং ধর্ম্মভাবপূর্ণ, জগতে এমন আর কোনও জাতির মধ্যে নাই। এমন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া দুইটী এক হইয়া যাওয়া; স্বামীরূপ মহাতীর্থে এমনি ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া তন্ময়ত্ব লাভ করিতে আর কোন্ জাতীয়া স্ত্রীলোকে পারে? হিন্দুর বর-কন্যার মিলন স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ। হিন্দুর বিবাহপদ্ধতি গভীর আধ্যাত্মিকতামূলক। হিন্দুর বিবাহ কেবলমাত্র ইহ জগতের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য নহে, উহা পরজীবনেরও পবিত্র বন্ধন—উহার উচ্চ আদর্শ চিরদিন সভ্য-জগতে সহৃদয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের নিকট অতীব আদরণীয়, এই জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দু-বিবাহ মহোচ্চ ধর্ম্মভাবপূর্ণ, বিচিত্র আদর্শস্বরূপে সমগ্র ভারতভূমির কোটি কোটি নরনারীর নিকট সম্মানলাভ করিয়া আসিতেছে। হিন্দু জানে—জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ঈশ্বরাধীন, হিন্দু শাস্ত্রের অমোঘ পবিত্র বিধান মানিয়া চলে বলিয়াই এখন, হিন্দু নাম ভারত হইতে লোপ হয় নাই, কিন্তু আজকাল তাহা এত শিথীল ও সঙ্কীর্ণ ভাবাপন্ন হইয়া আসিতেছে যে, কালে তাহা কসাইরত্তিতে পরিণত হইবে। আজ কাল কন্যার বিবাহে সকলেই বিপদগ্রস্থ হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-কায়স্থের গৃহে ইহা একরূপ সংক্রামক মহাব্যাধি রূপে পরিণত হইয়াছে যে ইহা বঙ্গসমাজ গ্রাস করিতে অগ্রসর হইয়াছে। যাঁহারা নিষ্ঠুর হস্তে এই বিবাহের উচ্চ আদর্শ চূর্ণ করিয়া সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি বাধাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা কখনই সমাজের বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। পুত্রের পিতাগণই এই সমাজদ্রোহের কারণ। তাহাদের কু-ব্যবহারে

হিন্দু সমাজ আজ পতিত, হিন্দুর পবিত্র শাস্ত্র পবিত্র সমাজ আজ মর্য্যাদাহীন। আমরা বলি,—পুত্রের পিতার নিকট কন্যার পিতার বা আত্মীয়-স্বজনের এত নিগ্রহভোগ কেন? কন্যারত্ন কি জগতে এতই নির্ম্মূল্য, আর পুত্ররত্ন কি এতই দুর্ম্মূল্য! পুত্র ও কন্যার মিলন লইযাই ভগবানের এই বিশ্ব-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। জগতে পুত্রেরও যেমনি আবশ্যক, কন্যারও তেমনি আবশ্যক, একের অভাবে আর একটী কিছুই নয়। পুরুষ-প্রকৃতি না হইলে একত্ব সম্পাদিত হয় না—বিবাহহীন পুরুষ বা প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ নহে—ইহা হিন্দুশাস্ত্রের অমোঘ উপদেশ। এক জন অবিবাহিত পুরুষ বা স্ত্রীলোক—হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত কোনও কার্য্যেরই অধিকারী নহে। হিন্দু-স্ত্রীই হিন্দু-সংসারের অলঙ্কার—হিন্দুর গৃহের আলো। এই শক্তিঅংশসম্ভূতা রমণীগণ হিন্দু-সংসারের দেবী-স্বরূপিণী। এই দেবী প্রসাদৎই এখন হিন্দুর হিন্দুত্ব—হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় আছে। তাহারা এখন ধর্ম্ম বজায় রাখিযাছে বলিযাই হিন্দুজাতি জগতে ধর্ম্মগর্ব্বে উন্নতশীর্ষ। হিন্দু বল দেখি, তোমার সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে এমন ধর্ম্মপত্নী না থাকিলে তোমার সংসার এত দিন শ্মশানে পরিণত হইত কি না, তোমার অবস্থার ব্যবস্থা থাকিত কিনা? ধর্ম্মভাবাপন্না, হিন্দু-স্বভাব-সম্পন্না স্ত্রী জাতি যেরূপ সংসারের ঔজ্জ্বল্য এবং শ্রী সম্পাদন করিতে পারে, সেরূপ আর কেহ করিবেনা, কেহ করিতে জানে না, তাহাদের প্রকৃতিও সেইরূপ নহে।

যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে স্ত্রী-না হইলে, কন্যা না হইলে, জননী না হইলে সংসার চলে না, তখন কন্যারত্নের প্রতি সকলের এত নিগ্রহাচরণ কেন? কন্যার পিতা কেনই বা এত লাঞ্ছিত, এত অপমানিত এত বিপদ গ্রস্থ। কন্যার পিতা তাহার প্রাণ সম কন্যার বিবাহের পণ দাবে বিডম্বিত আর পুত্রের পিতা আনন্দে উৎফুল্ল; কুলীনের একটী কন্যা হইলেই তাহার পিতা প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র বিবাহের জন্য তাহার পিতার মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতে লাগিল! যদি কন্যাটী জীবিত থাকে, তাহা হইলে কেমন করিয়া বিবাহ হইবে, অজস্র টাকা ব্যয় না করিতে পারিলেত একটী সৎপাত্রে তাহার কন্যা সম্প্রদান করা হইবে না; যেরূপ কাল পড়িয়াছে, পুত্রের বাজার যেরূপ মহার্ঘ্য হইযাছে, তাহাতে হয়ত তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে, এতদিন পরে হয়ত তাহাকে বাস্তু ভিটাটীর মাযা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে হইবে। এই সকল চিন্তা করিয়া কন্যার পিতা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন।

হিন্দু সমাজ আজ কেন এরূপ অধঃপতিত হইয়াছে? কেন তাহারা সংসারের আনন্দস্বরূপিনী রমণী-রত্নের প্রতি এত বিরূপ হইতেছেন? ইংরাজী শিক্ষার ফলে যে এই ঘোর দুর্দ্দৈব সমাজে প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই!

পূর্ব্বে সমাজে কন্যা-বিক্রয় হইত বলিয়া কন্যার পিতা সমাজচ্যুত হইতেন. কেহ তাহার সহিত আহার ব্যবহার করিত না, তাহার সহিত কথা কহিতেও লোকে ঘৃণা করিত। কিন্তু এখন পুত্র বিক্রয় সমাজে এত প্রবল হইয়াছে যে লোকে তাহার জন্য উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। আজ কাল ইহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই, অবাধে এইরূপ পাপ কার্য্য, কসাইয়ের কার্য্য সমাজে চলিয়া যাইতেছে, কতলোক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী হইতেছে, কেহ তাহার প্রতিকার-কল্পে বদ্ধ-পরিকর হইতেছেন না, অধিকিন্তু পুত্রের পিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে।

আজ কাল আর একটী মহাদোষ সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। সকলেই সুন্দরী পাত্রীর জন্য ব্যস্ত, পাত্রী সুন্দরী না হইলে পুত্রের

বিবাহ দিবেন না। কন্যাটি কাল হইলে বিবাহ-বাজারে অজস্র টাকা দিয়াও তাহাকে পাত্রস্থা করিতে পারা যায় না। আজ কাল কেহ সদ্বংশসম্ভুতা সুশীলা, গৃহকর্ম্মনিপুণা, শ্রমশীলা পাত্রী দেখিয়া বিবাহের প্রস্তাব করেন না। কেবল টাকা ও সুন্দরী হইলেই হইল: পাত্র হয়ত আবলুস কাষ্ঠের প্রতিমূর্ত্তি, তিনি চাহিলেন, পাত্রী পরমাসুন্দরী, ইহাতে মিলন কিরূপ সুন্দর হইবে, তাহা তাহাদের বুদ্ধিতে যোগাইয়া উঠে না। পুত্রের জন্য যেমন সুন্দরী পাত্রীর আবশ্যক, কন্যার পছন্দও ত সেইরূপ আছে? এরূপ পরিণাম চিন্তা না করিয়া বিবাহ দিলে তাহাতে কখনই সুফল ফলিতে পারেনা। যাহার ঘরে কুন্দনন্দিনী বা সূর্য্যমুখী, আয়েসা বা তিলোত্তমা নাই, তাহার সংসার কি চলে না—তাহারা কি সুখে সচ্ছন্দে দিন কাটাইতে পারে না? যাহারা সুন্দরী পাত্রী না হইলে বিবাহ দিতে চাহেন না, তাহাদের পাত্রটী কার্ত্তিকের নূতন সংস্করণ কিনা একবার ভাল করিয়া দেখা উচিত। আমাদের দেশের এবং সমাজের এই সকল যথেচ্ছাচার নিবারণ করিতে না পারিলে, বঙ্গ সমাজে আর শান্তির আশা নাই, কিন্তু এসকল অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে এখন কাহারও তাদৃশ দৃষ্টি আকর্ষিত হয় নাই।

অন্য সকল আন্দোলন ফেলিয়া আমাদের পবিত্র সমাজে যে সকল কুপ্রথা প্রবেশ করিয়াছে, যাহার জন্য লোকে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত, মর্ম্মাহত এক্ষণে সে সকল কুপ্রথা সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে দেশের চারিদিকেই জাগরণের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। দেশের লোকের জাতীয় উন্নতি সাধনের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। শিল্প বাণিজ্য, রাজনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই উন্নতি লাভের চেষ্টা চলিতেছে। সমাজের উন্নতও অনেক বিষয়ে সাধিত হইয়াছে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি দূষণীয় সামাজিক কুপ্রথাগুলির বিলোপ দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে আবার কতকগুলি ভয়ানক দোষ সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

আজ কাল কন্যার বিবাহ যে কিরূপ ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে, তাহা অবস্থাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু ইহার যথোচিত প্রতীকারের চেষ্টা দেখা যায় না অবশ্য কখন কখন কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার ব্যয়ভার হ্রাস করিবার জন্য সামান্যরূপ আন্দোলন হয় বটে, কিন্তু এই কুপ্রথা সমাজে এত বদ্ধমূল হইয়াছে যে, এই সামান্য আন্দোলন কিছুমাত্র ফলদায়ক হইতেছে না।

আজকাল কন্যাদায়ই সকল দায়ের প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ছেলের বাজারে ছেলের দর যেরূপ চড়িয়াছে ও চড়িতেছে, তাহাতে এই দায় হইতে উদ্ধার পাইতে গিয়া অনেকে যে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই বর্ত্তমানকালে যে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক ২।৩টী মেয়ের বাপ হইয়াছেন, তাঁহাকে অনেক স্থলেই পৈতৃক বাস্তুভিটার মায়া কাটাইতে হইয়াছে। আজকাল দিন দিন দেশের দুঃখ দারিদ্র্য বাড়িতেছে এবং সেই সঙ্গে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অবস্থাও শোচনীয় হইতেছে। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকেরই আয় অতি সামান্য। এই স্বল্প আয়ে পরিবার প্রতিপালন করাই কষ্টকর; ইহার উপর কন্যার বিবাহে বৈবাহিকের উদরপূরণ করিতে গিয়া তাহারা ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন, ইহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি! গভীর পরিতাপের বিষয় যে পুত্রের বিবাহে অতিরিক্ত পণগ্রহণরূপ ব্যাধি হিন্দু সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহে ক্রমশঃ সংক্রমিত হইতেছে। এখন দেখা যায় এই সংক্রামক ব্যাধির জন্য কেবলমাত্র আমাদের মতে ছেলের বাপই এ বিষয়ে প্রধান দোষী। তিনি তাহার দারুণ অর্থতৃষ্ণা অর্থাৎ

"পরের ধনে বড়লোক" হইবার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিবার জন্ত পুত্রবিক্রয়রূপ জঘন্ত ব্যবসা লজ্জাজনক বলিয়া মনে করেন না। পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই একটী পরীক্ষায় পাশ করিলেই তাহার পিতা পুত্রের জন্ত "এক রাজকন্তা ও অর্দ্ধেক রাজত্বের" স্বপ্ন দেখিতে থাকেন ;' কিন্তু তখনও তাহার পুত্র ভবিষ্যৎ জীবনে কর্ম্মক্ষেত্রে কতটা কৃতিত্ব লাভ করিবেন, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত থাকে। ভদ্রলোক হইয়া তাহারা যেরূপ সুকৌশলে কন্তার পিতার উপর স্বীয় "কসাই" বৃত্তি চরিতার্থ করেন, তাহা অতি বিস্ময়কর।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের বিবেচনায়, যুবকবৃন্দ দোষী। আক্ষেপের বিষয় তাহারা উচ্চশিক্ষাভিমানী হইয়া মেষের মত নিলামে বিক্রীত হইতে কোন দ্বিধা কিংবা লজ্জাবোধ করেন না। এই কি তাহাদের উচ্চশিক্ষার ফল ? এই কি তাহাদের আত্মসম্মানবোধ ? তাহারা উচ্চশিক্ষিত হইয়া কোনপ্রাণে একজন নিরীহ ভদ্রলোকের সর্ব্বস্বান্তের কারণ হয়েন,বুঝা দুষ্কর। তাহারা ইচ্ছা করিলেই অধিকাংশ স্থলে সমাজের এই কলঙ্ক দূর করিতে পারেন ; কিন্তু তাহা করিবেন কি ? যাঁহারা এইটুকু স্বার্থত্যাগ করিতে অসমর্থ, তাঁহারা কোন মুখে দেশোন্নতি করিবার আশা হৃদয়ে করেন, তাহা ভাবিবার বিষয়। তাহাদের ন্যায় উচ্চ শিক্ষিতের নিকট হইতে আমরা কি এতটুকু নিঃস্বার্থতার আশা করিতে পারি না ?

তৃতীয়তঃ অনেক স্থলে মেয়ের বাপও দোষী, কোন কোন অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক কন্তার বিবাহে স্বেচ্ছায় বরপক্ষীয়দিগকে অতিরিক্ত নগদ টাকা ও বহুমূল্য অলঙ্কারাদি দিয়া থাকেন। তাহাদের নিকটে আমাদের এই জিজ্ঞাস্য যে তাহারা কন্তা জামাতাকে দান করিবার ইচ্ছায় এইরূপ ব্যয় করেন, না নাম কিনিবার প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ করেন ? যদি প্রথম উদ্দেশ্য সত্য হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, বিবাহসময় ভিন্ন কি কন্তা-জামতাকে দ্রব্যসম্ভার উপহার দিবার আর কোনও সুযোগ পাওয়া যায় না ? স্বীকার করি, প্রচুর অর্থ ব্যয় করিলেও তাহাদের কিছুই আসে যায় না ; কিন্তু তাহাদের দৃষ্টান্তে কন্তাদায়গ্রস্ত মধ্যস্থ গৃহস্থগণ কিরূপ বিপদে পড়েন, সেদিকে তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় কি ? তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুসন্ধান করিয়া যখন বরকর্ত্তা কন্তাকর্ত্তার গলায় ছুরি দেন, তখন কন্তাকর্ত্তার কিরূপ অবস্থা হয়, সেটা একবার ভাবিয়া দেখেন কি ? যদি নাম কিনিবার এবং নিজের ঐশ্বর্য্য দেখাইবার উদ্দেশ্যেই তাহারা চালিত হয়েন, তাহা হইলে বলি, সে উদ্দেশ্যটা কি অন্য উপায়ে সাধিত হইতে পারে না ? এইরূপ মহাত্মাদিগের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন,তাহারা যেন স্বেচ্ছায় অর্থপিপাসু বরের বাপদিগের অর্থ-লিপ্সায় প্রশ্রয় না দেন।

আমরা এ পর্য্যন্ত যতটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহাতে দেখিয়াছি, বৈবাহিকের অর্থ লইয়া কোন বরের বাপই বড়লোক হন নাই। কন্তার বাপকে শোষণ করিয়া যে টাকা লওয়া হয়, সে গুলি সাধারণতঃ ইংরাজী বাদ্য রোশনাই, বাইনাচ প্রভৃতিতে ব্যয়িত হয়, হয়ত যৎসামান্য টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। পরের টাকায় এই সকল অনাবশ্যক কার্য্যে অর্থের শ্রাদ্ধ করিয়া কি লাভ হয়, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অনধিগম্য। আমাদের বিবেচনায় বরং ইহাতে সমাজের একটী মহা অকল্যাণ সাধিত হইতেছে। বরকর্ত্তা হয় ত মনে করেন, এইরূপ জাঁকজমকে বর লইয়া যাইলে লোকের মনে তাহার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা জন্মিবে, কিন্তু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের মনে হয়, বরের শোভা যাত্রা যেখানে যত জাঁকজমকের হইবে, সে স্থলে বুঝিতে হইবে বরকর্ত্তা কন্তাকর্ত্তার তত বেশী রক্তশোষণ করিয়াছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, এই দূষণীয় প্রথার প্রতীকার কি? কায়স্থসভা প্রভৃতি সমিতি গুলিতে এই বিষয়ে কিছু কিছু আন্দোলন হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু কেবল বক্তৃতা ও রেজলুশান পাশ করিলে কিছুই হইবে না। ইহার একমাত্র প্রতীকারের উপায় দেশের লোকের একতা, ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ, যতদিন আমাদের দেশের লোক স্বার্থে অন্ধ থাকিবে, ততদিন এই কুৎসিত প্রথা দূরীভূত হইবে না। সর্ব্বশেষে আমাদের নিবেদন যে, মাতৃস্থানীয়া রমণীগণও এই নিষ্ঠুর প্রথার প্রতীকার কল্পে সচেষ্ট হউন। তাহাদের উপর আমাদের দেশের উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। তাহারা যদি এই কুপ্রথার মূলোচ্ছেদনে বদ্ধ পরিকর হয়েন, তাহা হইলেই ইহা সমূলে উৎপাটিত হইবে, নতুবা নহে। তাঁহারা যদি তাহাদের পিতা স্বামী, পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতিকে এই শোষণ নীতি হইতে নিবৃত্ত রাখিতে, তাহাদের সকল শক্তির নিয়োগ করেন, তাহা হইলেই এই সমাজকলঙ্ক দূরীভূত হইতে পারে। তাহারা কি দেশের মুখের দিকে চাহিয়া একটুকু চেষ্টা ও স্বার্থত্যাগ করিবেন না?

সমালোচনা!

"সুকুমারী।"—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বি, এল প্রণীত একখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস। পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত আমরা পাঠ করিয়াছি, পুস্তকখানি যে একেবারে দোষ শূন্য তাহা নহে। তবে গ্রন্থকার সুকুমারীর চরিত্র যেরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন—তাহাতে গ্রন্থকারকে আমরা শত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি সুকুমারীর চরিত্র প্রত্যেক বঙ্গললনার পাঠ করা উচিত, দোষ ও গুণের ভাগ একত্র করিলে পুস্তকখানির গুণের ভাগ এত অধিক যে ইহা সাহিত্য সমাজে নিশ্চয়ই সমাদৃত হইবে।

বালক-সখা।—একখানি মাসিক পত্র, ইহা বালকদিগের জন্য প্রকাশিত হইলেও ইহাতে বৃদ্ধদিগের পড়িবার ও অনেক জিনিস আছে; পত্রিকা খানি বেশ চলিতেছে। আমরা ইহার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

"সত্যনারায়ণের পাঁচালী"।—শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র চৌধুরী-প্রণীত। আজ-কাল বাজারে যেরূপ সত্যনারায়ণের পাঁচালী পাওয়া যায় তাহার অপেক্ষা ইহা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। ইহাতে ব্রতকথা এরূপ বিশদভাবে বিবৃত করা হইয়াছে যে ইহা প্রত্যেক গৃহস্থেরই উপকারে আসিবে। মূল্য ৵০ আনা, পোঃ রূপসী, ময়মনসিংহ জেলায় গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

"কাজের লোক।"—ইহা একখানি মাসিক-পত্র, আজ কয়েক বৎসর ইহা বেশ দক্ষতার সহিত চলিতেছে। ইহাতে অনেক কাজের কথা থাকে, ইহা পাঠে গ্রাহকগণ অনেক নূতন তত্ত্ব অবগত হইয়া কর্ম্মজীবনের পথ প্রশস্ত করিতে পারিবেন। এরূপ মাসিকের আদর হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব।

শ্রীমাতৃ মূর্ত্তি।

নমি দেবী বেদমাতা, অনন্ত মহিমাযুতা
ত্রিলোকের প্রসবিতা ওঁকার রূপিনী।
কালীতারা মহাবিদ্যা, তুমি মা অনাদ্যা আদ্যা
জীবের পরমারাধ্যা ব্রহ্ম সনাতনী॥
শোভে পদে দিবাকর, নখরে তুষার কর,
ভ্রমে চকোর নিকর সুধাপান আশে।
পাদপদ্ম শোভাকর, গুঞ্জরিছে মধুকর,
ভাতি সরসিজাকর, রূপে তমোনাশে॥
কটীতটে নরকর, জঘন সুমনোহর
পূজিছে অমরবর মনের উল্লাসে।
মুক্তকেশী দিগম্বরা, অভয়া বরদা করা,
ভয়ঙ্কর হরদারা, অট্ট অট্ট হাসে॥
সর্ব্বাঙ্গে শোণিত ধারা, পীনোন্নত পয়োধরা,
বাম করে অসি ধরা, করাল বদনী।
শিরে কিরীট উজ্জ্বল, করে কিবা ঝলমল,
মুক্তাযুক্ত কুণ্ডল, জীহ্বাক নয়নী॥

শঙ্খ দারা সুনাসিকা, মূর্ত্তি ঘোর ভয়ানকা,
দৈত্য দর্প বিনাশিকা, ব্রহ্মাণ্ড পালিনী।
নরমুণ্ড মালা গলে, অনিশ শোণিত গলে
পতিত চরণ তলে শব শূল পাণি॥
কিশোরী গঞ্জিত শ্রোণী তাহে কণক কিঙ্কিণী,
বর্ণনব কাদম্বিনী, পীত ত্রিণয়না
সুবর্ণ কুণ্ডল কাণে, দামিনী দমকে ঘনে
সঙ্গে ভ্রমে শিবাগণে বিলোল রসনা।
বর্ণিতে শকতি মোর, কিবা শক্তি আছে কার,
ভাবে নাহি ভাব যায়, বর্ণিতে স্বরূপ।
ত্রিজগত বাঁধা যায়, পাদপদ্মে অনিবার,
বর্ণনে অসাধ্য তাঁর অপরূপ রূপ॥
চাহ মা মোদের পানে, বসি হৃদি পদ্মাসনে
চাল আর্ঘ্য হস্ত পদে গঙ্গাম্বুর পরে।
এই ভিক্ষা মাগী মোরা, পুরাও বাসনা তারা
করোনাকো দিশাহারা ফেলিয়ে বিপথে॥

সম্পাদক।

মানব জীবনের দায়িত্ব।

পৃথিবীর লোক সংখ্যা অনন্ত। উহাদের সম্প্রদায়গত নিয়মাদির; আদর্শও গণনাতীত। এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অপর সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম নীতি, সমাজ প্রভৃতির তুল্য সাদৃশ্য নাই বলিয়া জাতিগত বিদ্বেষাদি উহাদের মধ্যে আবাহমান কাল হইতে বিরাজমান। কিন্তু কতকগুলি কার্য্যকে সকল সম্প্রদায়ের মনস্বীগণই পুণ্যজনক ও পাপ জনক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পুণ্যকার্য্য সম্পাদিত হওয়ার সময় ঐ সব মহা পুরুষগণ বিপুল উৎসাহ দিয়া থাকেন, পাপ কার্য্য কৃত হওয়ার সময় পাপীকে তৎকার্য্য হইতে বিরত করার জন্য নানারূপ চেষ্টা বা পন্থা উদ্ভাবন করিয়া থাকেন। অকৃত কার্য্য হইলে পাপাশয়কে দণ্ড্য মনে করিয়া যথাদণ্ড প্রদানের জন্যও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েন। এরূপ সুনিয়ম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবর্ত্তিত না হইলে মানব সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় হইত না, এতদিন পৃথিবীর লোক উৎসন্ন যাইত। সকল সম্প্রদায়ের এই নিয়ামকগণ জগদীশ্বরের প্রেরিত মহাপুরুষ। উহারা বিভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও সমাজে শান্তি স্থাপনের জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট এই জন্য অসামান্য ও ভক্তির পাত্র।

আমরা কাহারও কাহারও মুখে শুনিয়া থাকি, কোন কার্য্য ভুলবশতঃ বা অজ্ঞানতা প্রভৃত অনুষ্ঠিত হইলে, সম্পাদক তৎকার্য্যের জন্য দায়ী নহেন। আবার কোন কোন বাকচতুর বলিয়া থাকেন, কার্য্যটি করার সময় আমার হিতাহিত জ্ঞান তিরোহিত হইয়াছিল, কে যেন আমাকে বল পূর্ব্বক কার্য্যটীতে নিয়োজিত করিয়াছিল, উহার ফলাফল বিচার করিয়া যে কার্য্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিব এমন সামর্থ্য আমার ছিল কোথায়? ইহারা এমনই তার্কিক যে অপরাধকে নিরপরাধ গণ্য করার জন্য যেরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহা শ্রবণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। অগণিত যুক্তির পর এই শ্রেণীর তার্কিক শেষে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েন যে, ভগবান মানবকে কখনই নির্দ্দোষ করিয়া গড়েন নাই। তাহাদের প্রকৃতি স্বভাবতঃই এত নীচ যে, ভগবান যদি দয়া করিয়া তাহাদের স্বভাব (Nature) পরিবর্ত্তিত না করেন, তাহা হইলে তাহারা কখনই দোষশূন্য (Perfect) হইতে পারিবে না। তবে দুই একটা যে মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, উহা তাহাদের শক্তি প্রসূত নহে, যিনি জীবের সৃষ্টি স্থিতি ও নিয়ন্তা তাঁহারই কৃপায়। সমাজ শিক্ষা, এবং বাহ্যিক প্রকৃতির মানব-হৃদয়ে এত প্রভাব যে তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া সংসার সাগরে মনুষ্য-বুদবুদের জয়ী হওয়া দুরাশা মাত্র। যখন ঐ গুলি নির্দ্দোষ নহে, তখন উহাদের প্রভাবে বা সাহায্যে যে চরিত্র গঠিত হয়, তাহা যদি নিষ্কলঙ্ক না হইল, তজ্জন্য বিজ্ঞলোক কাহাকে দোষী করিবেন?

আমরা প্রলোভনের বশীভূত হইয়া যতই অন্যায় কার্য্য করি, আপাত সুখের মনোবিমোহিনী ছায়া যতই আমাদিগের চিত্ত প্রমথিত করুক, যদি প্রথম হইতে আমরা আমাদিগের দুর্নিবার্য্য বাসনা জয় করিতে অভ্যস্ত হই, তাহা হইলে প্রলোভন বা মায়া বা অন্য কোন উপদ্রব আমাদিগকে বশীভূত করিতে পারে না।

তুমি যতই পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া থাক, একথা যদি স্বীকার না কর, তাহা হইলে তোমাকে উন্মাদ না বলিয়া ছাড়িব না। যখন কেহ প্রলোভনের দুর্চ্ছেদ্য ফাঁদে পতিত হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে বাসনা বা প্রবৃত্তি জয়ের জন্য সে বৈধ ভাবে চেষ্টা করে নাই। এতই যদি বাসনা জয়ের শক্তি মানবের অন্তরনিহিত থাকিবে, তাহা হইলে আমরা সুপথ ছাড়িয়া কুপথগামী হই কেন? বাসনা জয়ের জন্য আমরা ক্রমাগত চেষ্টা করি না বলিয়াই অনেক সময় আমরা কুপথগামী বা পথ ভ্রষ্ট হইয়া থাকি। অন্তর্নিহিত শক্তির বাসনা জয়ের সামর্থ্য আছে বলিয়াই আমরা পাপানুশোচনার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারি না। অন্তর্নিহিত শক্তির পাপদমনের ক্ষমতা আছে বলিয়াই পাপ কার্য্য করিয়া আমরা আমাদিগকে ধিক্কার দিই, পাপ জ্ঞান সঞ্চার হওয়ার সময় তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করি। নিষ্পাপ জীবন যাপন করার ক্ষমতা আমাদের নাই একথা বড়ই অযুক্তিপূর্ণ, বড়ই ক্লেশকর, বড়ই নিরুৎসাহদায়ক। যখন আমরা প্রলোভনের দুর্জ্জয় শক্তি ব্যর্থ করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হই, তখন মন সন্তোষে পরিপ্লুত হয় কেন? আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে বাসনা জন্মে কেন? ভাল ও মন্দ হওয়ার ক্ষমতা যদি আমাদের আয়ত্তাধীন করার সামর্থ না থাকিত, তাহা হইলে আমরা কখনই সুকার্য্যের জন্য আত্মপ্রসাদ এবং কুকার্য্যের জন্য বেদনা বা গ্লানী অনুভব করিতাম না।

আমরা সচরাচর যে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করি, উহা যদি অন্তর্নিহিত শক্তি বলে সাধিত না হয়, তাহা হইলে পুণ্য ও পাপের অনুভূতি মিথ্যা বলিয়া ধারণা করিতে হয়। উচ্চ সমাজ হইতে অশিক্ষিত সমাজের দিকে চাহিয়া দেখ, সকলেই মনে করিয়া থাকেন, মনুষ্যের ভাল ও মন্দ হওয়ার শক্তি ইচ্ছা সাপেক্ষ। পিতা প্রাণাধিক পুত্রকে এই বিশ্বাসের বলেই সর্ব্বদা সৎস্বভাব সম্পন্ন দেখিতে চাহেন, সৎশিক্ষা প্রদান করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন। নির্দ্দোষী ব্যক্তি দোষী ব্যক্তির কুসংসর্গ পরিত্যাগ করেন। সমাজ এই শক্তির উপর বিশ্বাস করিয়াই শাসন নিয়মাদির বিধি ব্যবস্থা দ্বারা সমাজের হিতসাধন করিয়া থাকেন। এই জন্যই আমরা প্রকৃত ভাল লোককে আদর করি, প্রশংসা করি, তাহাদের সমাগমে উৎফুল্লিত হইয়া থাকি। এই জন্যই যিনি আমাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া প্রাণ জুড়াই। এই জন্যই যাহারা আমাদিগের ক্ষতি করে, তাহাদের নিকট ক্ষতি পূরণের দাবী করিতে সঙ্কুচিত হই না। যে সমাজের নিয়ম ভঙ্গ করে, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহাকে সামাজিক শাসনাধীন করিতে চাহি। যদি মনুষ্যের অন্তর্নিহিত শক্তি অস্বীকার কর এবং ভাল মন্দ কার্য্যের জন্য যদি তাহাকে দায়ী না কর, তাহা হইলে সৎলোকের আ[illegible] উপকারীর প্রতি উপকৃতের কৃতজ্ঞতা, পাপীর দণ্ড বিধান কি অসঙ্গত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে? এখন কোন্ কথার উপর নির্ভর করিয়া সংসার সমুদ্রে এ জীবন ভেলা ভাসাইয়া দিবে? আত্মশক্তির উপর ভর করিয়া মানব

মহত্ত্বের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারে, না—মানব প্রলোভনদায়ক বহিঃ প্রকৃতি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ এবং শিক্ষার অধীন হইয়া চিরকাল পাপ মলিন থাকিবে।

যদি চিরকাল পাপার্ণবে ডুবাইয়া রাখার নিমিত্তই ভগবানের ইচ্ছায় বহিঃ প্রকৃতি, সমাজ ও শিক্ষা মানব হৃদয়ে অসীম আধিপত্য বিস্তার করে, তাহা হইলে যাহারা সুদীর্ঘকাল অসৎসংসর্গে—ধর্ম্মের বিরোধীয় অবস্থার মধ্যে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাহারা কিরূপে সৎপ্রকৃতি লাভ করেন? আমরা স্বীকার করি যে মানব চরিত্রের উপর অবস্থার প্রভূত প্রভুত্ব আছে কিন্তু সেই অবস্থা জয় করার ক্ষমতা ভগবান প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। যদি মনুষ্যের অন্তর্নিহিত শক্তি না থাকিত, এবং অবস্থানুযায়ী পাপ পুণ্য অর্জ্জিত হইত, তাহা হইলে যিনি চিরদিন ধর্ম্ম সাধনের অনুকূল অবস্থার মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তিনি পাপ প্রবাহে সাঁতার দিয়া জীবন কলুষিত করেন কেন? বাহ্যিক অবস্থা (External Circumstances) তোমার হৃদয়ের উপর যাহাতে মোটেই কার্য্য না করে, এরূপ চেষ্টা করা তোমার ভুল। বাহ্যিক অবস্থা ও অন্তর্নিহিত শক্তিই তোমার জীবনের পথনির্দ্ধারণ ও চরিত্রের উন্নতি সাধন করিবে। অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাব যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানব সগুণী প্রকৃতির হস্তে কলের পুত্তলির ন্যায় ক্রীড়া করিতে থাকিত, লক্ষ্য পথে চলার তাহাদের সামর্থ্য থাকিত না। তাহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিতে সম্পূর্ণ অশক্ত হইয়া পড়িত। যে পর্য্যন্ত আমরা মুক্তি লাভ না করিব, সে পর্য্যন্ত কোন না কোন কার্য্যের জন্য আমরা ভগবানের নিকট দায়ী থাকিব। মুক্তিকামীদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির প্রতিলক্ষ্য রাখিতে হইবে। অনেকে ব্যায়ামাদি দ্বারা শারীরিক বৃত্তি পরিচালন করেন, অনেকে বা জ্ঞানার্জ্জন দ্বারা মানসিক বৃত্তি ও উপাসনাদি দ্বারা আধ্যাত্মিক বৃত্তি পরিস্ফুরণ করিতে প্রয়াসী পান। যিনি যে বৃত্তিটিই পরিস্ফুরিত করুণ না কেন, কেবল একটি বৃত্তি লইয়া থাকিলে চলিবে না। সকল বৃত্তি গুলিই পরিমার্জ্জিত হইতেছে কিনা দেখিতে হইবে। যিনি তাহা দেখেন না, বা দেখিবার সামর্থ্য লাভ করেন না, তিনিই হয়—শারীরিক অসুস্থতা বা হৃদয়ের দরিদ্রতা অথবা উপাসনার শক্তি হীনতা নিবন্ধন এসংসারের কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারেন না। যিনি কর্ত্তব্য পালনে অসমর্থ, তিনি তাহার যাবতীয় কার্য্যাবলীর জন্য ব্যক্তি বিশেষের নিকট দায়ী হইয়া থাকেন। এখন বুঝা গেল, আমরা যেটুকু অসৎ কার্য্য করি তজ্জন্য আমরা দায়ী, কারণ কুকার্য্য ছাড়িয়া সুকার্য্য করার আমাদের ক্ষমতা আছে। আমরা সকলেই কি সমান পরিমাণে সমাজে বা লোকের নিকট বা ভগবানের সমীপে একই কার্য্যের জন্য তুল্য দায়ী হইব? উপরোক্ত বৃত্তিগুলি সকলেই অনুশীলন করিতে পারেন, কিন্তু সকলের অবস্থা সুযোগ, বা শক্তি সমান নহে বলিয়া তুল্য ভাবে আমরা ভগবানের নিকট অপরাধী নহি। তুমি আমি যে কার্য্য করি, যিনি বিচারক, তিনি আমাদের প্রতিটি শক্তির

এবং উন্নতি অবনতির পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যদি প্রমাণীত হয় যে আমরা অমূর্ত্তের কার্য্যে সাধ্যমতশক্তি প্রয়োগ করি নাই, তাহা হইলে আমরা দোষী সাব্যস্ত হইব। আমাদের শক্তি অপব্যবহারেই আমরা দোষী বা দায়ী। শক্তির অতীত কার্য্য সম্পাদন করিতে না পারিলে দায়ী হইব কেন? শক্তি অর্জ্জন সাপেক্ষ। কিন্তু কোন শক্তিই অল্প সময়ের মধ্যে অর্জ্জিত বা স্ফূরিত হইতে পারে না, যে সময়ের মধ্যে যাহা অর্জ্জিত হওয়া উচিত, আমি যদি অবহেলা করিয়া সে সময়ের মধ্যে তাহা অর্জ্জন না করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি অপরাধী। একজন অলস ব্যক্তি যদি তাহার কার্য্যকারী শক্তি যথাসময়ে যথা বিধানে পরিস্ফূরিত না করিয়া থাকে, তবে আজ হউক, কাল হউক, সে তাহার যথোচিত উন্নতি করে নাই বলিয়া মর্ম্মপীড়ায় অধীর হইবে। যদি প্রত্যেক লোক তাহার অপরাধ বুঝিয়া অপরাধের জন্য অপরকে দায়ী না করিয়া স্বয়ং দায়গ্রস্ত হয়, তাহা হইলে সে অনতি বিলম্বেই পাপের বেগবান স্রোতে বাঁধ দিতে পারে। মানব কোন সময় সতর্কতা, অধ্যবসায় প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে? যখন সে ধারণা করিতে পারে যে সৎকার্য্য করার তাহার একটি ক্ষমতা রহিয়াছে। অন্তর্নিহিত শক্তির উপর অসীম বিশ্বাস অর্থাৎ স্বাবলম্বন ব্রতই আমাদের উন্নতির একমাত্র মূল কারণ। স্বাবলম্বন ভিন্ন কেহ সন্তোষ লাভ করিতে পারে না। যাঁহারা জীবনের পথে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন, আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে না শিখিয়া সামান্য উদরান্নের জন্ত পরের পদগ্রহ হইতে লজ্জিত হয়েন না, তাহারা লোকের নিকট যেমন ঘৃণাস্পদ, তেমনি ভগবানের নিকট দণ্ডার্হ। এ জগৎ তাহাদের নিকট নিরাশার কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন, সন্তোষ যে কিরূপ চিত্ত প্রসাদন করে, তাহা তাহারা অনুভব করিতে পারেন না।

আমরা কাহারও অবস্থার বিচার করিয়া সন্তোষের পরিমাণ করিয়া লইতে পারিনা। অবস্থার সঙ্গে যদি সন্তোষের নৈকট্য সম্বন্ধ থাকিত, তাহা হইলে যিনি ধনী তাহার সন্তোষ নির্ধনীর তুলনায় অপরিমেয় প্রমাণীত হইত। যিনি রাজ চক্রবর্ত্তী তাঁহার মণি মাণিক্য সুশোভিত সুরম্য রঙ্গ মহলে প্রবেশ কর; সম্ভবতঃ সেখানে তুমি বিলাসের সম্মোহন ছবি দেখিয়া চমকিয়া উঠিবে। সেখানে কিসের অভাব? মূল্যবান জিনিষের কথা যদি ধর মণিমুক্তা মরকত খচিত রত্ন সিংহাসন, প্রভাকর রশ্মিবিনিন্দিত অসংখ্য সুবিন্যস্ত ঝাড় লণ্ঠন ফানস, হেমপাত্র সংলগ্ন সুবাসবর্ষী পুষ্পস্তবক, দুটি মনোহর সমুন্নত, রজতাপ পত্র, মূল্যবান হীরকাধার পরিপূরিত নাসারন্ধ্রামোদী গন্ধদ্রব্য, কৃত্রিম লতা-পাতা ফুল-ফলাঙ্কিত প্রাচীর গাত্রস্থ ভুবন মোহনী রমণীদের রমণীয় প্রতিকৃতি; যিনি ইহার অধীশ্বর, তিনি হয়ত তাহার ইয়ার বন্ধের সঙ্গে মদিরা-বিভোর হইয়া, অপসরা সদৃশ নর্ত্তকীগণের নৃত্যাদি দর্শনে ও রসালাপনে প্রমত্ত রহিয়াছেন, আর একজন শাকান্নোপজীবি দরিদ্র কৃষকের ঘরে প্রবেশ কর, কৃষকের গৃহিণী হয়ত দুটি ভাত ও একটু কলায়ের ডাল রাখিয়া স্বামীর প্রত্যাগমন

অপেক্ষায় পথপানে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে, কৃষক যথা সময়ে আজ কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেনা, আরও কিছুকাল কার্য্য করিলে যদি ভগ্ন কুটীর খানির মেরামত যোগ্য অর্জ্জন হয়, নতুবা দুগ্ধ পোষ্য শিশুগণ কিরূপে শ্রাবণের বারিধারায় জীবন বাঁচাইবে। তুমি একবার দরিদ্র কৃষকের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিও, যখন সে মধ্যাহ্ন-তপতাপ তপ্ত দেহ খানি লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসে, তাহার মুখ খানি কত প্রফুল্ল। তখন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিনা যে কবি কেবল সৌন্দর্য্য বর্ণনায় শ্বেতোৎপল, হরিচরণ-পল্লব, ইন্দুকর কন্দল, মৃণালকান্তি, নলিনীপত্র খুজিয়া বেড়ান কেন? যে সেই কর্ত্তব্য কার্য্য পালন সম্ভূত আনন্দ বিহ্বল মুখার বিন্দ খানি একটু ভাবুকের নয়ন দিয়া অনিমেষ লোচনে দৃষ্টি করিয়াছে, তাহার লোচন কি আনন্দরসে প্রসিক্ত হয় নাই? তখন কি সেই দরিদ্রের আনন্দ রস প্রদিপ্ত বদন খানি মদিরা-মত্ত বিলাসী রাজ চক্রবর্ত্তীর পাপ-পঙ্কিল-মুখখানি অপেক্ষা অত্যাধিক প্রভাব সম্পন্ন উজ্জ্বল ও কমনীয় বোধ হয় নাই?

যিনি জীবনের দায়িত্ব স্বীকার করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন, তিনি দিনান্তভোজী,, মহা দরিদ্র হউন না কেন, তাহার সন্তোষের সঙ্গে দায়িত্ব-বিহীন সাময় নরপতির ও তুলনা হয় না। কর্ম্মক্ষেত্রে কৃষক নরপতি অপেক্ষাও জীবনের দায়িত্ব বেশী বুঝিয়াছে, তাই সে দুরবস্থা সম্পন্ন হইয়াও দর্শকের শিক্ষার, সুখের ও অনুগ্রহের যোগ্য হইয়াছে। তাই সন্তোষ-অবস্থায় তারতম্য সাপেক্ষ নহে, জীবনের দায়িত্বজ্ঞান ও কর্ম্ম সাপেক্ষ। এ সংসারে কর্ম্মের অভাব কি? কর্ম্ম অনন্ত। অনন্তকাল স্থায়ী অনন্ত কর্ম্মময় সংসারে আমার অমুষ্ঠের কি? হিন্দু ঋষিরা বলিতেছেন "তুমি জ্ঞান দ্বারা কর্ম্ম স্থির করিয়া লও, সমস্ত কর্ম্মই মুক্তির পথ স্বরূপ" এই কর্ম্ম স্থির করার সময়ই জীবনের দায়িত্বজ্ঞান পরীক্ষিত হয়। যিনি জীবনের যেরূপ দায়িত্ব বুঝিয়াছেন, তিনি সেইরূপ কর্ম্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। জীবনের দায়িত্ব বোধের তারতম্যানুসারে পিতা পুত্রে বিরোধ হয়, ভ্রাতায় ভ্রাতায় ঐক্য থাকেনা, রাজায় প্রজায় বিসম্বাদ ঘটে, জীবনের দায়িত্ব না থাকিলে বিবিধ কর্ম্মের সৃষ্টি হইতনা। এই দায়িত্ব বোধ হইতেই কর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মে। লোকে কর্ম্ম করিয়া শান্তিপায়, কর্ম্মপথে বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, তাহা পদদলিত করিবার শক্তি লাভ করে, দুই একজন লোক এ পৃথিবীতে জীবনের দায়িত্ব এত অধিক বুঝিতেন যে, তাহাদের অসীম অধ্যবসায় ও প্রাণপণ সাধনা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। পাশ্চাত্য দেশের মহাত্মা মার্টিন লুথার যখন স্বীয় জীবনের দায়িত্ব বুঝিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন, তখন তাঁহার পিতা স্বার্থমোহে তাঁহাকে সে পথ হইতে প্রতি নিবৃত্ত করার জন্য কত ভৎসনা, কত উৎপীড়ন, কত আর্থিক ক্লেশ প্রদান করিলেন মার্টিন লুথার। তাহাতে ভ্রুক্ষেপও করিলেন না। অন্তর্নিহিত শক্তিবলে তিনি সঞ্জীবিত ছিলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন "বাইবেল-এর জার্ম্মান ভাষায় অনুবাদ না করিলে লোকের

ধর্ম বিষয়ে কুসংস্কার থাকিয়া যাইবে। ধর্ম যাজকেরা স্বার্থ ও অর্থের বশীভূত হইয়া ধর্ম পিপাসুদিগকে অবৈধ পথে প্রধাবিত করিয়া ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করিবে। মার্টিন আত্ম-শক্তির উপর বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি সাধারণের সুবিধার জন্য বাইবেল গ্রন্থ জার্মাণ ভাষায় অনুবাদ করিলেন, এবং ধর্ম্ম যাজকের কুসংস্কার গুলির প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। Papal party স্বার্থ ও ক্ষমতা পরিচালনে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধান্ধ হইল। প্রতিপদে ধর্ম্মপ্রাণ মার্টিনের জীবন নাশের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল। মার্টিন তখন তাহাতে অচল, অটল, অবিকম্পিত ও ধ্যানমগ্ন। সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াই তিনি বুঝিয়া-ছিলেন মানবজীবন দায়িত্ব পূর্ণ, যখন নিষ্প্রাণ জীবন যাপন করা যাইবে, তখনই এজীবনের দায়িত্ব ভার লাঘব হইবে। তিনি নির্ম্মল জীবন লাভের জন্য ভগবানের স্মরণ লইলেন, এবং বুঝিলেন অন্তর্নিহিত শক্তি এক ভগবানের আরাধনায় অনেকটা উদ্বোধিত হইতে পারে। মনের যখন এই অবস্থা, তখন ঈশ্বর পরায়ণ লুথার গাহিলেন,—

Nothing in my hand I bring ;
Simply to Thy cross I cling ;
Naked, come to Thee for grace ;
Vile, I to the fountaintly ;
Wash me, saviouror I die.

লুথার যখন St. Panl এ বক্তৃতা প্রদান করিতেন এবং বাইবেলের অনুবাদ করিতেন, তখন সেখানে ভয়ঙ্কর Plague এর প্রাদুর্ভাব হয়, অন্যত্র সকল লোক প্লেগাতঙ্কে স্থানান্তরে পলায়ন করে, লুথার তখন কি করিয়াছিলেন। তিনি তাহার বন্ধুকে লিখিয়া-ছিলেন,—আমি সহজে স্থানত্যাগ করিতে পারিব না, ভগবান নিশ্চয়ই আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন।

দায়িত্বজ্ঞান হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইলে, নিরাশ প্রাণেও আশার সঞ্চার হয়। নির্ধনী ও ধনবানের তুল্য শক্তি বোধ করে। যে জীবনকে দায়িত্ব বিহীন মনে করিয়া এসংসারে যথেচ্ছাচারী হয়, হউক সে পণ্ডিত, হউক সে ধনবান, হউক সে বাগ্মী, তাহার জীবনের সৌন্দর্য্য কোথায়? সহ সম্পাদক।

ব্যাধি।

(১)

হাইপারবোলা এবং প্যারাবোলা যখন কিছুতেই এ মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে চাহিল না তখন বাবা সেয়ানা হইলেন, যে টাকা গুলা এতদিন জলে ফেলিয়া আসিতেছিলেন—তাহা লোহার সিন্ধুকে তুলিতে লাগিলেন। কলেজের রেজিষ্টার হইতে আমার নাম লোপ পাইল। আমিও বাঁচিলাম।

(থিওরেম) থিওরেম গুলা যে মাথায় ঢুকিল না, সে কেবল মাথার দোষ নহে, ব্রজ বাড়ুর্য্যের মেয়ে কিরণ শশীরও একটু দোষ ছিল; সেই আমারি মাথাটীকে খাইতে বসিয়াছিল। ব্রজ বাড়ুর্য্যে কলেজের প্রফেসর, কিরণ শশী তাঁহার বিধবা কন্যা। একপাড়াতেই বাড়ী। ব্রজবাবু কোথাও পড়াইতে যাইতে নারাজ। বাবার তাড়নায় নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই কনিকসখানা

হাতে লইয়া বৈকালে তাঁহার নিকট যাইতাম। প্রফেসর যখন নীরস সমস্যা গুলির বোঝাইবার জন্ত দুরূহ প্রয়াস পাইতেন, কন্যাটী তখন জানালার আড় হইতে মধ্যে মধ্যে সরল দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া সকলই গোল বাধাইয়া দিত।

যদি ব্রজ বাবুর পত্নী বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে যে মাথাটা খাদ্যরূপে পরিণত হইতেছিল—তাহা হয়ত এককালে শাম্‌লার আধার হইতে পারিত, কিন্তু কিরণকে প্রসব করিয়াই তিনি স্বর্গারোহণ করেন। বোধ হয় সেই হইতে প্রফেসরের মার্জ্জিত বুদ্ধি কিছু স্থূল হইয়া পড়িয়াছিল; নচেৎ এত বিদ্যা থাকিতেও আমাদের এ বিদ্যাটুকুর প্রতি গোড়াতেই তাঁহার নজর পড়ে নাই কেন?

এক দিনেই যে একটা হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু যেদিন ইহার প্রথম সূত্রপাৎ হয়, সেদিনের কথা আমার বেশ মনে পড়ে। বাবা "রায় বাহাদুর" উপাধি পাওয়ায় আমাদের বাড়ীতে বড় ধুমধাম হয়। প্রেত পরীর নৃত্য এবং "কেলনার" কোম্পানীর শ্রাদ্ধের অবসানে "ব্রজ সংহার" নাটকের অভিনয় হইতেছিল। ত্রিতলের বারান্দায় স্ত্রীলোকদিগের বসিবার স্থান হইয়াছিল এবং যেখানে পর্দার প্রান্ত যেণটা বাতাসে উড়িতেছিল, সেইখানে কিরণ শশী আমার বালিকাস্ত্রীর সহিত বসিয়া অভিনয় দেখিতেছিল।

সেই অভিনয় দর্শনই কাল হইয়াছিল। বোধ হয় সেই ঐক্যতান বাদন মুখরিত সঙ্গীতোচ্ছাসে একটী করুণ বাসনা আমার মনে জাগিয়া উঠিয়া অরে অরে কিরণের অন্তরটীকে মাতাইয়া তোলে, এবং বিধাতা তাহাকে যাহা হইতে বঞ্চনা করিয়াছেন, যেদিকে বেচারার দৃষ্টিপাৎ করিতে নাই, হয়ত সেইদিকেই ভয়ে ভয়ে এক একবার চাহিবার জন্ত তাহার অবাধ্য হৃদয় যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে উৎসুক হইয়া পড়ে নাই, তাহা কে বলিতে পারে? সুন্দর দেখিবার জন্য যে সময়ে কিরণ শশীর মনপ্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল—সেই সময়ে যেন শ্রাবণ দিবালোকের ন্যায় সেই পালঢাকা স্নিগ্ধোজ্জ্বল ছায়ালোকে তাহার দৃষ্টি আসিয়া এই তরুণ যুবকটীর উপর পড়িল। বোধ হয় সে দেখিয়া থাকিবে আদ্ধির পাঞ্জাবীর মধ্য হইতে যে বর্ণপ্রভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে তাহা স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল এবং মনোরম, এবং তাহা যতই দেখা যায় ততই আবার দেখিতে ইচ্ছা করে। কতক্ষণ হইতে কিরণ আমার প্রতি চাহিয়াছিল তাহা জানিতে পারি নাই, আমি উপরে যাইবামাত্র তাহার দৃষ্টি লজ্জাবনত হইয়া পড়িল। তথাপি আমার মনে হইল ঐ চাহনির সহিত ভাষাহীন তাড়িত-বার্ত্তার একটা কিছু না কিছু সংস্রব আছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই বারকতক চক্ষুর মিলন এবং অধর প্রান্তে নিদ্রালস স্বল্পহাসি আমার সংশয়কে প্রতীতিতে পরিণত করিয়া দিল। ইতিপূর্ব্বে লেখাপড়ার সঙ্গে আমার যে একটা গুরুতর সম্বন্ধের কথা চলিতেছিল, সেইদিন হইতেই সেটা পাকা হইয়া আসিল।

আমার স্ত্রীটী শ্যামবর্ণা স্পষ্টই বলি কালো; সেই কারণে বোধ হয় কিরণ তাহাকে আমার সম্পূর্ণ অনুপযুক্তা মনে করিল। তাহার পর

যখন সে অবগত হইল যে বালিকা নিতান্তই নিরক্ষরা, এবং কথা কহা দূরে থাকুক, লজ্জায় আমার কাছে ঘেঁসিতে চাহে না, তখন সহসা আমার প্রতি কিরণের বড় স্পৃহা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল, তাহার সমস্ত হৃদয়খানি অযাচিত ভাবে আমাকেই দান করিয়া ফেলিল। তাহার আকুল দৃষ্টি আমাকে জানাইল এই অযত্নাত্ত মণিটী যে ধুলায় লুটাইবে, তাহা সে সহ্য করিতে পারে না, সে সযত্নে ইহাকে হৃদয় কোটরে তুলিয়া রাখিবে। তখন অপেরা বড় জমিয়া গিয়াছে, থন্‌থন্‌ করিয়া একটা সুর উঠিতেছে। আমার প্রাণের যে অংশ এতদিন শূন্য পড়িয়াছিল, সেই সুরের মধ্যে তাহা ভরাট হইয়া উঠিল।

(২)

কলেজে নাম কাটাইয়া আমি কিছুদিনের মধ্যেই ঘোরতর সৌখীন হইয়া পড়িলাম, হাওয়া খাওয়ার আধিক্যে কোচম্যান সহিস গুলাকেত জ্বালাতন করিয়া তুলিলাম। সরস্বতী কঢ়িবিদ্যায় আমার প্রতি যে পক্ষপাতীত্ব করিয়াছিলেন, কোমল বিদ্যায় আমাকে সেই পরিমানে অনুগ্রহ করিলেন। "এেকেটেতাগ্‌" বিদ্য মাথায় ঢুকিতে লাগিল এবং সন্ধ্যার পর মুখ হইতে দ্রব্য বিশেষের যে মৃদু গন্ধটুকু বাহির হইত "কাশ্মিরবোকের" উগ্র সৌরবে তাহা কেহই অনুভব করিতে পারিত না।

তবুও পিতার প্রিয় হইবার আকাঙ্খায় ব্রজবাবুর নিকট পড়িতে যাওয়টা ছাড়ি নাই বরং পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ঘন ঘন যাইতাম। "লেডী অফ্‌দিলেক্‌" পড়াইতে ব্রজবাবুরও আর কোন কষ্ট হইত না, এমন কি দিনে দিনে তিনি অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিলেন। হ্যারিসনরোড্‌ এবং বহুবাজার দুইটা পোষ্ট আফিস্‌ ঘুরিয়া আমাদের চিঠিগুলিও নিরাপদে যাতায়াত করিতে থাকিল। বড় সুখে দিন কাটিতে লাগিল।

এই সময়ে শরৎ কুমারীকে আমার আদৌ পছন্দ হইত না। বৃহৎ নামটা সংক্ষিপ্ত করিয়া আমি যেমন ডাকিতাম—শোরি, সেও তেমনি দুই একটির অধিক কথা কহিত না, একে কালো তাহার উপর অতখানি ঘোমটা এবং অতটা প্রগাঢ় নিদ্রা আমার একান্ত অসহ্য বোধ হইত। পূর্ণিমা যাহাকে সাদরে আহ্বান করিতেছে, অমাবস্যায় তাহার মন উঠিবে কেন? সেদিন বাদল নামিয়াছে। আমি বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করিতেছি। রাত্রি দশটার পর ব্রজ বাবু আহার করিতে গেলেন। একেলা বসিয়া আমি নিবিষ্ট চিত্তে যে মুখখানি ভাবিতেছিলাম, সহসা বারান্দা সংলগ্ন দরজার পাশে তাহা দেখাগেল! আমি উঠিয়া নিকটে গেলাম। শঙ্কা বিজড়িত ভাষায় যে অতি সামান্য মাত্র কথা হইল, তাহা হইতেই আমি বুঝিলাম যে, কিরণ বলিতে চাহে—তুমি ছাড়া যাহা কিছু সকলই আমার চক্ষের সমক্ষে ভাসিয়া বেড়ায় মাত্র! সেই রাত্রি হইতে আমরা উভয়েই মজিলাম। আমাদের এই কালীন অবস্থাবর্ণনা করা যায়না। দূর হইতে দর্শন, ভয়ে ভয়ে বিরল সাক্ষাৎ, এবং আমার ও ভয়ে ভয়ে কশ্চিৎ দুই একটি কথা, ইহাতেই যে কি তীব্র আসক্তি ছিল তাহা বলা কঠিন. অথচ ইহাই এত সন্তোষের কারণ হইয়া

পড়িল যে দুইজনেই তাহাতে তন্ময় হইয়া গেলাম। মানবহৃদয় সুখাধিক্য একেবারে গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়াই হোক অথবা যে কারণেই হোক, অধিক আশা কাহার ও মনে স্থান পায় নাই, বরং মাঝখানে গুরুজন এবং সমাজ শাসনের ব্যবধান বজায় রাখিয়া অভ্রান্ত হৃদয় দানই উভয়ের লক্ষ্য হইয়া ছিল। কল্পনা আমাদের পথ সাফ করিয়া দিল; তাহার সাহায্যে পরস্পরের বাস্তব দূরত্ব বিদূরীত হইয়া গিয়াছিল। রাত্রে আমার মনে হইত একটী বিধবা বালিকা তাহার বৈধব্যের চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া মিছরির চুড়ি এবং সীতাহার পরিয়া আমার শয্যা প্রান্তে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে ঘুম ভাঙ্গাইতে আমার সাহস হইত না, ভয় হইত 'পাছে টুকটুকে কিরণের পরিবর্ত্তে কালো গোরী জাগিয়া ওঠে! অপ্রিয় চৈতন্ত অপেক্ষা সুমিষ্ট ভ্রান্তিটাই সমধিক ভাল লাগিত।

এই ভ্রান্তি—এই মোহাবেশ, এই সোনার স্বপন যদিচ আমার আন্তরিক প্রিয় এবং অপর কাহারও ক্ষতি কর নহে, তথাপি অধিকদিন স্থায়ী হইল না। "স্যাম্পেনের" সাহায্যে আকাশ মার্গে মায়াকানন নির্ম্মাণ করিয়া যে কল্পনা-কুসুম গুলি কুটাইতেছিলাম একটা প্রবল ঝড় আসিয়া তাহাদের ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। সেই মায়ালোক মরীচিকার সহসা অন্তর্হিত হইয়া তথা হইতে কি ভীষণ এক সত্য উৎপন্ন হইল, একদিন কিরণের পত্রে অবগত হইলাম যে আমাদের বিদ্যা জাহির হইয়া গিয়াছে; সুন্দর ছন্দবন্ধপদ্যলিখিত একখানা পত্র কোন গতিকে ব্রজ বাবুর হাতে পড়িয়া অত্যন্ত কঠিন সমালোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভয়ে আমার প্রাণ শুকাইয়া গেল। বাবা, দাদা ইঁহারা শুনিলে বলিবেন কি? হয়ত ব্রজ বাবু এখনি একথা প্রকাশ করিয়া দিবেন, তখন আমি কি করিয়া তাঁহাদের নিকট মুখ দেখাইব? ডুব দিয়া যে কয় ঢোক জল খাইয়া ফেলিয়াছি, এখন তাহা উদ্গীরণ করিবার উপায় কি?

কোচম্যান আসিয়া জানাইল কম্পাস্ প্রস্তুত। আমি বলিলাম ঘোড়া খুলে দাও আজ আর বেড়াতে যাবার ইচ্ছা নাই। কোন সময় ব্রজবাবু অগ্নি শর্ম্মা হইয়া উপস্থিত হন এবং কথাগুলা কিরূপ রং চং দিয়া বাড়াইয়া বলেন তাহা আমাকে দেখিতে ও শুনিতে হইবে; আমি বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পারিলাম না।

সন্ধ্যার পর ছাদে পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে হইল কিরণেরই বা কি অবস্থা হইয়াছে? ব্রজবাবু যে তাহাকে কোনরূপ শাসন করেন নাই, তাহারাই বা নিশ্চয়তা কি? আর যদিই বা করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহার কোমল প্রাণে কি প্রচণ্ড আঘাতই না লাগিয়াছে! ব্রজবাবুর বাড়ী আমাদের বাটী হইতে রশি খানেকদূরে অবস্থিত, তবুও আমার মনে হইতে লাগিল যে একটী লাঞ্ছিতা, ভূলুণ্ঠিতা বালিকার দীর্ঘনিশ্বাস বাতাসের সঙ্গে ছাদে ছাদে ভাসিয়া ভাসিয়া আমাকে তাহার সহানুভূতিশূন্য গভীর মর্ম্মবেদনার আভাস দিতেছে,—ঐ না তাহার কম্পিত হৃদয়ের

ছুরু ছুরু ধ্বনি শোনা যায়? কয়েক মুহূর্ত্ত আমি রুদ্ধ শ্বাস হইয়া রহিলাম।

(৩)

মাসখানেক কাটিয়া গেল। ব্রজবাবু একবারও আমাদের বাড়ীতে আসেন নাই; বাবা অথবা বড়দাদাকে যে কোন কথা বলিয়াছেন এমত বোধ হয় না, কারণ তাহা হইলে তাঁহারা চুপ করিয়া থাকিতেন না। ব্রজবাবুর কি উদ্দেশ্য তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমি মহা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলাম।

এই এক মাস আমার যে কি অবস্থায় কাটিয়াছে, তাহা আজি আর ভাল করিয়া বলিতে পারি না। প্রথম প্রথম কিরণের কি হইতেছে ভাবিয়া আমি মহা উতলা হইতাম, কিন্তু ক্রমে নিজের চিন্তা এতই অধিক হইয়া উঠিল যে আর তাহা ভাবিবার অবসর রহিল না। ঘুরিতে ফিরিতে মনে হইয়াছে-বুঝি এইবার ধরা পড়িলাম। বড়দাদা এবং বাবার পদ শব্দ পাইলেই আমি চমকিয়া উঠিতাম। রাত্রে যখন বাবা ড্রয়িংরুমে বসিয়া বিষয় কার্য্য দেখিতেন এবং বড়দাদার সহিত নানারূপ মামলা মোকদ্দমার পরামর্শ করিতেন তখন আমার মনে হইত আর কিছুই নহে—আমার সম্বন্ধে কথা হইতেছে, এখনি আমাকে ডাকাবেন এবং না জানি কি ভয়ানক অপমানই করিবেন। দৈবাৎ কোন প্রয়োজন বশতঃ তাঁহাদের কেহ আমাকে ডাকিলে ভয়ে আমার প্রাণ কণ্ঠ-সংলগ্ন হইয়া আসিত।

একমাসে আমার ঘাড়ের রক্ত শীতল হইয়া গেল, আমার ব্যাধি আরোগ্য হইল। যে স্বর্ণ মদিরার প্রবল নেশায় আমাকে মাতোয়ারা করিয়া দিয়াছিল, তাহা ছুটিয়া গেল এবং খোঁয়ারির সঙ্গে দারুণ অনুশোচনা আসিয়া জুটিল। বিষম ভয়ে অস্থির হইয়া কেবলি আমার মনে হইত—হায় হায়! কল্পনায় মজিয়া কেন এ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম? ইহা যে পাপ, এ পথে যে কাঁটা আছে, যে যায় সেই মরে, ইহা কেন আগে মনে হয় নাই? তাহা হইলে ত আজি আমাকে এ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইত না। ভয় এবং অনুতাপ উভয়ে সংমিলিত হইয়া আমার মোহ দূর করিয়াছিল; হৃদয় পটে কিরণ শশীর যে ছবিটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে চন্দ্রোদয়ে আঁধার রাশির ন্যায় তাহা বিলীন হইয়া গেল।

এই যে আত্ম প্রবঞ্চনা, ইহার মূলে কি ছিল? অনন্ত সুন্দর প্রেম? না! দুষ্টমতি শয়তান!

এ তাহারই খেলা। সেই এই মোহজাল বিস্তার করিয়া আমাকে জড়াইতেছিল; তাহারই প্ররোচনায় আমি কল্পনালোক সৃজন করিয়া মরণের পথে ধাইয়াছিলাম। তাহারই কুহকে পড়িয়া আমার দিব্যদৃষ্টি রুদ্ধ হইয়া ছিল, বিকৃত চক্ষে কিরণকে অত সুন্দর দেখিয়াছিলাম। আর নহে! আর নহে! আর আমি শয়তানের ক্রীড়া পুত্তলী হইব না। আজি আমার চক্ষু ফুটিয়াছে, আজি আমি দেখিতে পাইতেছি কিরণ এবং শৌরীর মধ্যে কত প্রভেদ! কিরণ যাহাই হউক না কেন, শৌরীর অধিকার কখনও সে পাইতে পারে না। কেননা, একজন ভালবাসা আর একজন লালসা, একজন সুহ-

লক্ষ্মী আর একজন গৃহের কলঙ্ক, একজন তাপিতের আশ্রয় আর একজন ত্রিতাপের কারণ, একজন অমৃত ফল আর একজন কেবল মাত্র মাকাল, দূর হইতে আমাকে মোহিত করিতেছিল। কিরণ পাপ. শোরী পুণ্য, পুণ্যের সহিত কি পাপের তুলনা হইতে পারে?

নাভিমূল হইতে উখিত দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর শান্তি বোধ হইল। হৃদয় কি এক অভিনব বলে বলীয়ান হইয়া উঠিল। যে ভয়ে এতদিন ভাল করিয়া চক্ষু মেলিতে পারি নাই তাহা আর আমাকে অভিভূত কবিতে পারিল না।

একদিন মোড়ের মাথায় ব্রজবাবু সহিত সাক্ষাৎ হইল। কুশল জিজ্ঞাসার পর বলিলেন—তুমি কি পড়া শুনো একেবারে ছেড়ে দিলে না কি?

কিছুক্ষণ আবল তাবল বকিয়া আমি বলিলাম—আজ—যাব এখন।

যে বাড়ীতে মাসাধিক কাল ঢুকি নাই, হৃদয়ে যথেষ্ট বল লইয়া প্রদোষের স্বল্পান্ধকারে আবার তাহার মধ্যে প্রবেশ কবিলাম। ব্রজ বাবু তখন জল যোগ করিতেছিলেন, আমাকে নিকটে বসিতে বলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আকের টিংলি চিবাইতে চিবাইতে সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ তোমাকে এমন অন্য-মনস্ক দেখচি কেন?

বাস্তবিক তখন আমি নিজের মনে নিজেই মগ্ন ছিলাম, শ্বাস প্রশ্বাস গুলি পর্য্যন্ত গণনা কবিতেছিলাম। "আজ্ঞে না" "কিছু না" বলিয়া সামলিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম। ব্রজবাবু বলিলেন-বাপুহে লুকোও আর যাই কর, কিছুইত আর আমার জান্‌বার বাকী নেই।'

ওয়েষ্টকোটের যে সর্ব্বশেষ বোতামটা ছিড়িয়া গিয়াছিল; সেইখানে আমি চাহিয়া রহিলাম। ব্রজবাবু একদৃষ্টে আমাকে দেখিতে লাগিলেন। কি মর্ম্মভেদী চাহনি! হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত যেন দেখিয়া লইতেছেন। তথাকার সমস্তটা তাঁহার নজরে পড়িল কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি বলিলেন—তা সে জন্য তোমাকে বিশেষ অনুযোগ করতে চাইনে, এখন বুঝতে পারচ যে সম্পূর্ণ অন্যায় হইয়াছিল!

আমার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়াগিয়াছে, কথা কহিবার সামর্থ মোটেই নাই।

ব্রজবাবু বলিতে লাগিলেন—এ সংসারের পথ বড়ই পিচ্ছিল, পদে পদে পতনের আশঙ্কা আছে, সাম্‌লে চলবার একটু ক্রটী হলেই পড়তে হয়। তোমরাত ছেলে মানুষ, জ্ঞানী ব্যক্তিরাই কত আছাড় খেয়েচেন। তবে তফাৎ এই যে কেউ পড়বার আগেই সবধান হয়, কেউ পড়তে না পড়তে আবার উঠে দাঁড়ায়, অন্ততঃপক্ষে ওঠবার চেষ্টাও করে, তারাই ধন্য! আর যারা পড়ে আর উঠতে চায়না, আমি তাদের মুখ দেখিনে।

আমার চক্ষের পাতা ভিজিয়া উঠিল, ব্রজবাবুর পায়ের উপর পড়িয়া বলিলাম আমায় ক্ষমা করুন।

একগাল হাসি হাসিয়া পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি আমাকে উঠাইলেন, বলিলেন—যখনই শুনেচি তখনই, ক্ষমা করিচি। ছেলে-

পিলের উপর রাগ করে যে সকল দিক মাটী করব, তেমন বোকা আমি নই। কিরণের জন্যে বড় ভয় হয়েছিল বাপু! তা সে আপনা থেকেই উঠে দাঁড়িয়েচে, আমাকে বেশী কিছু বলতে হয় নি।

এমন সময়ে দালান হইতে কে বলিল বাবা তোমার বেলের সরবৎ তৈরী হয়েছে। ব্রজবাবু বলিলেন—এইখানে নিয়ে এস।

সাদা পাথরবাটী হাতে করিয়া একটী বিধবা তথায় উপস্থিত হইল, তাহার মস্তকটী সম্পূর্ণ মুণ্ডিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা-কেই কিছুদিন আগে আমি মূর্ত্তিমতি লালসা, গৃহের কলঙ্ক এবং পাপ মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আর সে তাহা নাই! আত্ম সংযমের ফলে এখন সে গঙ্গাজলধৌত বিল্ব-পত্রের ন্যায় পবিত্র—তেমনই সুন্দর।

কিরণ পাখা লইয়া ব্যজনকরিতে লাগিল, ব্রজবাবু বলিলেন—বিদ্যাসাগরের মত মন্দ ছিল না—এই সব বিধবাদের আবার বিবাহ হওয়া উচিৎ। হয় এদের প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভের উপায় করে দেওয়া হোক্। না হয় আবার বিয়ে দেওয়া হোক্। তা বাপু প্রকৃষ্ট জ্ঞান-লাভ সেই ভগবত প্রাপ্তির উপায় আমরা কেউই জানিনে, মাঝে থেকে এদের কেবল থান পরিয়ে, আলো চাল খাইয়ে এমন দুয়ের বার করে রাখবার দরকার কি? আর তার ফলও যে সকল সময় ভাল হয়, তাওনয় হাতে কলমেত দেখলে।

আমি বলিলাম—এখা ঘটেছিল, একথাটা না হয় বাদ দেন, আমাদের ঘরের বিধবারা যতই দুয়েরবারে পড়ে থাক্, মোটের ওপর তারা দেবী, এমন দেবীশ্রেণী কি সংসারের পক্ষে মঙ্গল জনক নয়?

ব্রজবাবু কোন উত্তর দিলেন না, কিরণ পাখা খানি ভূমিতে রাখিয়া বলিল—রমনদা বাড়ী যাও?

আন্তরিক পুলক সহকারে তাহার মুখপ্রতি চাহিলাম, দেখিলাম উজ্জ্বল নয়নদ্বয় হইতে সহস্র সহস্র রশ্মি বিচ্ছুরিত হইতেছে—সকল গুলিই নূতন এবং অপূর্ব্ব তেজময়।

আমি তখনই বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।

কৃষি কর্ম্ম।

—:•:—

(২)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা কৃষি কর্ম্ম যে হেয় নহে, তাহা অবলম্বন করিলে যে স্বীয় পদগৌরব হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে, চাষা আখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে তাহার কোনও অর্থ নাই। আমাদের শাস্ত্র অনেক স্থলেই কৃষির প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন এবং কৃষি কর্ম্মোপযোগী-যোগী উপদেশ আদিও দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পরাশরীয় কৃষি শাস্ত্র খানি কৃষি বিষয়ক অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। অন্যান্য পুরাণ সংহিতা-দিতেও প্রসঙ্গতঃ কৃষির আলোচনা দেখিতেই পাওয়া যায়। পাবনায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণের সম্মিলনীতে কৃষিতে যে পাতিত্য দোষ নাই তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব কৃষি

কার্য্য অবলম্বন করা যাইতে পারে; তাহাতে কোন বাধা নাই। তবে কথা হইতেছে যে কাগজের ক্ষেত্রে কলম হল চালনা দ্বারা অক্ষর বীজ বপনেই দেশের কৃষির উন্নতি যদি পর্য্যবসিত হয় তাহা হইলে ফল ও যাহা হইবার তাহাই হইবে ও তাহাই হইতেছে। পাবনায় এক্ষণে পণ্ডিতগণ স্বহস্তে হল চালনা করিয়া যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেন তাহা সেই ক্ষেত্রেই যদি সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে, অন্য কোনও কার্য্যকর ভাবে যদি তাহার প্রচার না হয়, তবে হল কর্ষণের শাস্ত্রীয় বৈধতা প্রমাণেরই বা কি আবশ্যকতা ছিল? দেশে অনেক লোক এরূপ আছেন যাঁহারা ইচ্ছা করিলে এই কৃষি ব্যবসা অবলম্বন করিতে পারেন, তাঁহারা চাকুরী প্রত্যাশী না হইয়া এ দিকে মনো নিবেশ করিলে সব দিকেই সুবিধার সম্ভাবনা হয় নাকি? দেশের লোক যাহারা উচ্চ পদে চাকুরী করিতেছেন অর্থাৎ দু-দশ-পাঁচশ, বেতন পাইতেছেন তাঁহাদিগকে অবশ্য চাকুরী ছাড়িয়া কৃষি অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিই না, তবে যে সমুদয় যুবক অথবা মধ্যবর্ত্তী অবস্থার গৃহস্থ তেমন কিছুই করিতেছেন না, তাঁহাদের পক্ষে কৃষি ব্যবসা অবলম্বন শ্রেয়ঃকলপ বলিয়াই বিবেচনা হয়, আজকাল আমাদের দেশের অনেক সুশিক্ষিত যুবক জাপান, আমেরিকা, ইংলণ্ড ইত্যাদি স্থান হইতে কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা পূর্ব্বক কৃতিত্ব লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহারা যদি তাঁহাদের সেই সব পাশ্চাত্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আমাদের দেশের জল, মাটী, সার প্রভৃতির পর্য্যবেক্ষণে এবং দেশের কৃষকের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির চাষের সমালোচনায় নিয়োগ করেন এবং তৎকালে তাহার উন্নতি বিধান করেন তাহা হইলেই এই শিক্ষা সার্থক হয়, কিন্তু তাহা না করিয়া যদি নির্ব্বিচারে অধীত বিদ্যার উদ্গীরণ মাত্রই করেন, তবে যে তাহা দ্বারা দেশের কৃষি পদ্ধতির বা দেশের কৃষক কুলের বিশেষ কিছু উপকার হইবে তাহা আমাদের বোধ হয় না। কারণ দেশ ভেদে, জল, বায়ু, ভূমির অবস্থা ইত্যাদির যে পার্থক্য হয় তাহার দিকে দৃষ্টি না রাখিলে কোন কাজ হইতে পারে না। আমাদের দেশীয় কৃষকদিগের সহিত আলাপ করিয়া, তাহাদের কৃষি প্রণালী বিশেষরূপ বুঝিয়া লইয়া তাহার উপর গবেষণা পূর্ব্বক দোষ উদ্ঘাটন এবং তন্নিরাকরণের চেষ্টা দেশীয় ভাবে করিলেই প্রকৃত উপকারের আশা কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা এপর্য্যন্ত সেরূপ কোন উদ্যোগ আয়োজনের চেষ্টা তো দেখিতেছি না। গবর্ণমেণ্ট যে সমুদয় কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন তাহাতে অধ্যয়নকারী যুবকগণকেও এই পথই অবলম্বন করিতে হইবে। দেশের যত কৃষক যে ঐ সব বিদ্যালয়ে পড়িয়া কৃষি পণ্ডিত হইয়া বাহির হইবে, তাহা কখন কল্পনাও করা যায় না। তবে ঐ বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া যদি অভিজ্ঞ যুবকগণ পল্লীতে পল্লীতে গিয়া স্বীয় স্বীয় অভিজ্ঞতার ফল হাতে কলমে প্রচার করিতে থাকেন তাহা হইলে দেশের কৃষক কুল স্বচক্ষে ঐরূপ সুফল দেখিয়া ক্রমে ক্রমে তদনুরাগী হইবে—তাহাতে সন্দেহ নাই। একই ফসল তাহার জমিতে যাহা ফলিতেছে তাহারই পার্শ্বস্থ উন্নত প্রণালী অনুষ্ঠিত ক্ষেত্রে তদপেক্ষা অনেক

অধিক ফলিতেছে ইহা যখন সে দেখিবে তখন স্বতঃই সেই প্রণালীর পক্ষপাতী সে হইতে চাহিবে। নতুবা আমাদের কৃষি প্রদর্শনী প্রভৃতিতে যে সব জিনিস দেখান হয় তাহা কৃষকেরা দেখিলেও উহা তাহাদের মত "মূর্খের" অসাধ্য বলিয়া বিবেচনা করে সুতরাং তাহা তাহারা হাতে কলমে ঘাটাইতে সাহসীই হয় না। কিন্তু বিস্তৃত ভাবে আদর্শ কৃষি ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা দ্বারা এই সুফলের আশা বিশেষ ভাবেই করা যাইতে পারে।

এজন্য আমাদের দেশের জমিদার গণের কর্ত্তব্য যে ঐরূপ কৃষি বিদ্যা পারদর্শী যুবকগণকে বেতন দ্বারা নিযুক্ত করিয়া নিজ নিজ জমিদারীর মধ্যে কৃষক বহুল স্থান নির্ব্বাচন করিয়া ইহাদের তত্ত্বাবধানে তথায় আদর্শ কৃষি ক্ষেত্র স্থাপন করা এবং কৃষক প্রজাগণের মধ্য হইতে ঐ ক্ষেত্রের কৃষাণের কার্য্যের জন্য লোক নির্ব্বাচন করিয়া দেওয়া। তাহা হইলে তাহারা ঐরূপ কৃষি বিশারদ ব্যক্তির অধীনে কার্য্য করিয়া ঐ সব চাষ ও পাইট করা, সার দেওয়া প্রভৃতির প্রণালীতে দক্ষতা লাভ করিবে এবং ক্রমে ক্রমে নিজনিজ ক্ষেত্রেও তাহার প্রচলন করিতে থাকিবে। একস্থানে এইরূপ তিন চারি বৎসর থাকিয়া তথাকার কৃষককে ঐ সব প্রণালী শিক্ষা দিয়া আবার উপযুক্ত স্থান বুঝিয়া অন্যত্র ঐরূপ ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্রই এইরূপ উন্নত প্রণালীর শিক্ষক প্রচলিত হইয়া দেশের প্রকৃত-মঙ্গল সাধন করিতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থায় দেশের জমিদারগণের কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই বলিয়াই বোধ হয়। কৃষি ক্ষেত্রের উৎপন্ন ফল শস্যে পরিদর্শকের বেতন ও অন্য সমুদয় খরচা নিশ্চয়ই পোষাইয়া যাইতে পারে, এবং লাভ থাকিবারই বিশেষ সম্ভাবনা। তবে যদি লাভ নাই থাকে এবং এমন কি কিছু ক্ষতিও সহ্য করিতে হয় তবে প্রজার ও দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য তাহাও স্বীকার করা জমিদারগণের পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়।

দেশের কৃষক কুলের অবস্থা উন্নত না হইলে, কৃষি জাত দ্রব্যের উৎপন্নের পরিমাণ আরও অধিক না হইলে কৃষি প্রধান ভারতের স্থায়ী মঙ্গল কোথা হইতে হইবে? বৈদেশিক উন্নত প্রণালীর কৃষির সাহায্যে উৎপন্ন ইক্ষু ও তৎসম্ভূত শর্করার সহিত দেশীয় ইক্ষু শর্করা যে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিতেছে না তাহার মূলেও ঐ বিভিন্নতাই বর্ত্তমান। দেশের কৃষককে উন্নত প্রণালীর কৃষি শিখাইতে হইলে রীতিমত হাতে কলমেই শিখাইতে হইবে। তাহাদের কাছে বক্তৃতায় কোন ফল হইবে না, অথবা বৎসরান্তে কোনও এক কৃষি প্রদর্শনীতে উন্নত প্রণালীতে উৎপন্ন শস্যও ফল মূল তাহাদিগকে দেখাইয়া দিয়া ক্ষান্ত হইলেও চলিবে না। এই যে সব কৃষি প্রদর্শনী খোলা হয় তাহাতে সহস্র সহস্র বা লক্ষ লক্ষ টাকাও ব্যয় হয় কিন্তু এইরূপ স্থায়ী কোনও উপকার জনক কার্য্যের অনুষ্ঠান ত তাহাতে করা হয় না।

আমাদের বিবেচনায় কৃষি প্রদর্শনীর জন্য উদ্ধৃত অর্থ হইতে যদি কতকগুলি টাকা পৃথক

করিয়া রাখিয়া দেওয়া যায় যে তদ্দারা উন্নত প্রণালীর কৃষি তত্ববিদ এবং সেই তত্ব এদেশের জল মাটীর উপযোগী করিয়া প্রয়োগ করিতে সমর্থ উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগ পূর্ব্বক কৃষক দিগের গ্রামে গ্রামে কোন কোন ফসলের উন্নত প্রণালীর চাষ সম্বন্ধে হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া হইবে, এবং সেই সব ক্ষেত্রের ফল শস্য পুনরায় প্রদর্শনীতে দেখাইয়া উপযুক্ত হইলে পুরস্কার দেওয়া যাইবে তাহা হইলে প্রদর্শনীর প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয়। নতুবা যেরূপ ভাবে এই প্রদর্শনী খোলা হয় তাহাতে কৃষির প্রকৃত উন্নতির পক্ষে কোন সাহায্য হয় বলিয়া আমরা মনে করিনা। বিলাতী কৃষকদিগের ঐরূপ প্রদর্শনীতে উপকার হইতে পারে কারণ তাহারা এই ভাবে শিক্ষিত হইয়াছে। আমাদের দেশের কৃষক সাধারণ ঐরূপ কার্য্যতৎপর নহে। কৃষির মঙ্গল কামী ব্যক্তি গণের এই বিষয়টি বিবেচ্য।

সাধারণ যুবকগণের কৃষিকার্য্য অবলম্বন করায় আর আর যে অন্তরায় আছে তাহা ও তন্নিবারণের উপায় সম্বন্ধে বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ,।

ভিক্ষা।

--০--

অয়ি শান্ত স্নিগ্ধ উষা কনক বরণি
অলস অরুণে টানি লয়ে ধীর পদে
ছড়ায়ে কিরণ এই খর স্রোতা নদে
এসো আলো করি মোর আঁধার তরণী।
সারা রাত্রি অবিরাম বাহিয়াছি তরী,
করিয়াছি বহু যুদ্ধ ঝঞ্ঝা বায়ু সনে
সুচিভেদ্য অন্ধকারে একা হাল ধরি
আসিয়াছি বহু দূর অবসন্ন মনে।
চালাতে পারি না আর আলোক অভাবে
পূর্ণ এ তরণী মোর, খরস্রোত পরে
বাঁধিতে পারি না পাল এ শিথিল করে,
এতদূর এসে শেষে তরী ডুবে যাবে
ভাবিতে বেদনা প্রাণে উঠিতেছে জাগি,
তাই উষা তোমা পাশে আলো ভিক্ষা মাগি॥

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ মিত্র।

ভীষণ বরষা।

--ঃ×ঃ--

নিদাঘ হইল গত, সরস বরষাগত
বিপিন নীরদ জালে নবদেহ ঢাকিল।
ঢালে জল, মেঘ দল, ধরাতল সুশীতল।
চাতক পিপাসানল, নির্ব্বাপিত হইল।
বিরহ নিদাঘ দায়, মিলন-জীবনাশায়।
মানস চাতক মম, মনানলে দহিল।
কেন সে প্রাণেশ ঘন, মিলনাম্বু বরষণ
নাহি করে হায় হায় কোথায় সে রহিল।
নবোদিত ঘন, ঘন, করি প্রিয় সম্ভাষণ
প্রেমাধীন চাতকের মনস্তাপ ঘুচালো।
মম প্রিয় জলধর, করিয়া মোহনস্বর
মানস শিখিকে মম আজ নাহি নাচালো।
প্রেমাধীনা নদীগণে তুষি সুখ-সংম্মিলনে
রত্নাকর-জল-নিধি হৃদয়েতে ধরিল।
মম আশা স্রোতস্বতি বিরহে বিশীর্ণা অতি
আজো প্রিয় পয়োনিধি স্পর্শ নাহি করিল।

ফুটিল কেতকী ফুল, সৌরভেতে বনাকুল।
মধুলোভে অলিকুল ছুটোছুটি ছুটিল।
মানস মধুপ মোর, যে মধুপানে সে ভোর,
যে অম্লান পুষ্পগুলি আজো নাহি ফুটিল।
শ্রাবণে বারিদচয়, বারি বর্ষে এ সময়
পুষ্করিণী ক্ষীণ দেহ পরিপুষ্ট করিল।
মন বাঁকা জলাশয়, ক্ষীণ দেহ সদা রয়,
সাফল্য সলিলে তাহা আজো নাহি ভরিল।

শ্রীবিপিন চন্দ্র চৌধুরী।

অপেক্ষা।

একলাটী এই—
আমারে ফেলে,
কোথা বল তুমি—
চলিয়ে গেলে ?
কাঁদিলাম কত
না চা'লে ফিরে,
উপেক্ষা করিলে
মাথার কিরে।
তোমাকে ছাড়িয়া
এসেছি পাছে,
তবু তুমি মম
আইসে কাছে।
তোমারে আমার
রাখি না আগে,
তোমার কথাটী
পরাণে জাগে।

শ্রীঅমূল্য চন্দ্র সমদ্দার।

বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতি বঙ্গভাষার প্রাচীন ও আদি কবি। কিন্তু আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য যে, সেই বঙ্গের উজ্জ্বল রত্নের বিষয়ে নানরূপ ভ্রান্ত মত পোষণ করিয়া আসিতেছি। কেহ বলেন কবির প্রকৃত নাম বসন্ত রায়, বিদ্যাপতি তাঁহার উপাধি মাত্র। কিন্তু ইহা একান্ত ভ্রম পূর্ণ। সত্য বটে, বসন্ত রায় নামে একজন কবি ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন এবং পদকল্পতরু, ও পদকল্পলতিকাতে তাঁহার রচিত অনেক পদাবলী দৃষ্টি গোচর হয়, কিন্তু তাঁহাদের রচিত পদাবলী পাঠ করিলে অনায়াসেই বুঝা যায় যে বিদ্যাপতি ও বসন্ত রায় স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন।

স্থানাভাবে আমরা উভয় কবির পদাবলী বেশী উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। কেবলমাত্র সুবিধার জন্য ও নমুনা স্বরূপ উভয় কবির দুইটী পদাবলী এখানে লিখিলাম।

বিদ্যাপতির পদাবলী।

।কেদার।

শুন শুন গুণবতি রাধে। পরিচয় পরিহর কোন অপরাধে॥ গগণে উদয়ে কত তারা। চাঁদ আনহি অবতারা॥ আপনি কি কহব বিশেখি। নাথ লখিমীচর লেখিনা লেখি॥ শুনি ধনি মনোভদি ঝুর। তবহি মনহি মনী পুর॥ বিদ্যাপতি কহে মিলন ভেল। শুনইতে ধন্দ সবহি দৈ্ত গেল॥

বসন্ত রায়ের পদাবলী।

। বিভাস ।

আলো ধনি সুন্দরী কি আর বলিব।
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব।
তোমার মগিন মোর পুণ্য পুঞ্জ রাশি।
মরমে লাগি রহে মধুর মৃদু হাসি॥
আনন্দ মন্দিরে তুমি জ্ঞান শকতী।
বাঞ্ছা কল্পলতামোর কামনা মূরতী॥
সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি সুখমোর ঠাম॥
পাশরিব কেমনে জীবনে রাধানাম॥
গলে বনমালা তুমি মোর কলেবর।
রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর॥

উভয় কবির বাসস্থান সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উল্লেখ আছে। বসন্তরায় যশোহর জেলাবাসী ; তাঁহার পিতার নাম ভবানন্দ রায়। বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী ও তাঁহার পিতা গণপতি বিদ্যাপতির নাম-ধেয় যে সকল পদাবলী দৃষ্টি গোচর হয়, তাহা বসন্তরায়ের পদাবলী অপেক্ষা শতাংশে সুমধুর ও উচ্চাঙ্গ ভাবপূর্ণ। ইহা ছাড়া বিদ্যাপতি একজন বিখ্যাত সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত বলিয়া বিদিত। কিন্তু বসন্তরায়ের পদ-কর্ত্তা ভিন্ন, সংস্কৃত পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি নাই। আর ও জানা গিয়াছে বসন্তরায় ৪৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জগতীতলে বিরাজিত ছিলেন ; কিন্তু বিদ্যাপতি যে সুদীর্ঘ অশীতি বর্ষ বয়ক্রম পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে বসন্ত রায় বিদ্যাপতির অনেক পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এতগুলি প্রমাণ স্বত্বেও উভয়কে একই ব্যক্তি ঠাওরান নিতান্তই ভ্রান্তি মূলক।

কেহ বলেন বিদ্যাপতির প্রকৃত নাম দম্পতি নাথ। কিন্তু ইহাও পূর্ব্বের ন্যায় প্রমাণাভাব। কারণ দম্পতি নাথও বিদ্যাপতির অনেক পরের লোক। দম্পতি নাথ বসন্ত রায়ের সমসাময়িক বলিয়া বোধ হয়। বিদ্যাপতি উচ্চ দরের কবি। তাঁহার গান এরূপ মহত্বাব পূর্ণ য আজি পর্য্যন্ত তাঁহার আসন সকলের উচ্চে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্য। রাধাকৃষ্ণের প্রেম তিনি ভাবের যে উচ্চ গ্রামে গাহিয়াছেন সেরূপ আর কেহই পারে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কেহ কেহ বলেন বিদ্যাপতি হিন্দি কবি, এজন্য বঙ্গ-ভাষা ভাষী ব্যক্তিগণের গৌরব অনুভব করিবার কারণ নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করুণ, কবি (Cauter bury Teleis Chancer প্রণীত) কণ্টার বেরির গল্প, ফরাসী ভাষা মিশ্রিত লেখা, তা, বলিয়া তাহাকে কেনা ইংরাজ-কবি বলিয়া গৌরব অনুভব করেন ? প্রকৃত কথা বিদ্যাপতির কতকগুলি গান সরল বাঙ্গালায় লিখিত, কতকগুলি বা হিন্দিভাষা মিশ্রিত। আমাদের ধারণা বিদ্যাপতিকে হিন্দি কবি বলা অপেক্ষা বাঙ্গালা কবি বলাই সঙ্গত।

বিদ্যাপতির পুস্তকের ও কবিতার বিষয়ে আলোচনার পুর্ব্বে তিনি কোন সময়ে, কোথায় জন্মিয়াছিলেন সে বিষয় একটু আলোচনা করা যাউক। কিন্তু যাহার নাম লইয়াই এইরূপ গোলোযোগ তখন তাঁহার বিষয় যে প্রায়ই অন্ধকারাচ্ছন্ন তাহা বলাই বাহুল্য। কেহ বলেন বিদ্যাপতির জন্ম স্থান বীরভূম প্রদেশে। কাহারও কাহারও মতে তিনি বাঁকুড়া জেলার

অন্তঃপাতি ছাতনা প্রদেশবাসী। * অপর কেহ বলেন;— তিনি যশোহর জেলার ভূর্শট গ্রামবাসী। প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে ও বঙ্গদর্শন ৪র্থ খণ্ডে বিদ্যাপতির পরিচয় লিখিত হইয়াছে যে, মিথিলায় পঞ্জী নামে এক বৃহৎ গ্রন্থ আছে। তাহাতে তত্রত্য নৃপতিগণ ও পণ্ডিতগণের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই গ্রন্থে বিদ্যাপতির পিতার নাম গণপতির পিতামহের নাম জয়দত্ত, প্রপিতামহের নাম ধীবেশ্বর, বৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম দেবাদিত্য এবং অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম ধর্ম্মাদিত্য বলিয়া উল্লেখ আছে। বিদ্যাপতি মিথিলার রাজা শিবসিংহ ও লখিমা দেবীর আশ্রিত ছিলেন শিবসিংহ ১৩৬৯ শকে সিংহাসনারোহন করেন। বিদ্যাপতি ১৩৫৫ শকে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৪০৩ শকে পরলোক প্রাপ্ত হয়েন। খুব সম্ভব তিনি ছাতনা প্রদেশে জন্মিয়াছিলেন ও পরে মিথিলার রাজার নিকট গিয়াছিলেন। সেখান হইতে গান ও পুস্তকাদি লিখিয়াছিলেন। মিথিলায় তাঁহার জন্মস্থান নহে এটা নিশ্চয় †।

বিদ্যাপতি, রামপ্রসাদের ন্যায় যদৃচ্ছাক্রমে গান লিখিতেন। ঐ সকল পদাবলী ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবেই ছিল, অধুনা তাহার কিয়দংশ পুস্তক-নিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র। তাঁহার অধিকাংশ গান রাধাকৃষ্ণের প্রেমাভিনয় বিষয়ক।

আমরা এতাবৎকাল দেখাইয়াছি যে বিদ্যাপতি একজন কবি। কিন্তু তিনি যে একজন প্রধান সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন তাহারও ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁহার প্রণীত "পুরুষ পরীক্ষা" একখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত পুস্তক। কেহ কেহ কেহ বলেন "পুরুষ পরীক্ষা" বঙ্গভাষায় লিখিত, কিন্তু এইমত সম্পূর্ণ ভ্রম পূর্ণ। তাহা সংস্কৃত গদ্যে লেখা এবং মূল পুস্তক অদ্যাপি মিথিলা প্রদেশে প্রচলিত আছে। ঐ পুস্তক রাজা শিবসিংহের সময়কার লেখা। "পুরুষ পরীক্ষা" প্রথমে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত করেন ও ১৮১৫ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুরে মিশনরিদের স্থাপিত মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়। ঐ পুস্তক ফোর্ট উইলিয়ম স্কুলে পঠিত হইত। "পুরুষপরীক্ষায়" ধর্ম্মভাব-যুক্ত কতকগুলি আদর্শ পুরুষের চরিত্র ও আট চল্লিশটি নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিত আছে। কতকগুলি ধর্ম্ম-বিষয়ক ও কতকগুলি বীরত্ব ব্যঞ্জক। ঐ পুস্তক ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দে ইংরাজী ভাষায় শোভা বাজারস্থ রায় কালীপ্রসন্ন বাহাদুর কর্ত্তৃক, লর্ড বিশপের অনুমোদনে অনূদিত হয়।

"দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী" ও একখানি বিদ্যাপতি লিখিত সংস্কৃত পুস্তক। মিথিলার রাজা হরদেব নারায়ণ ওরফে নরসিংহের সময় ঐ পুস্তক লিখিত হইয়াছিল। নরসিংদেব ১৪৭১ খৃঃ অব্দে রাজা হয়েন। রাজ পুত্র নারায়ণের জন্মের সময় আশীর্ব্বাদ স্বরূপ উহা লিখিত হয়। "দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনীর" কিছু কিছু অংশ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন কর্ত্তৃক দুর্গোৎসবতত্ত্ব নামক পুস্তকে

* ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে ঐরূপ লিখিত আছে।

† বাঙ্গালার ইতিহাস প্রণেতা ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, তাঁহার মিথিলায় জন্মস্থান লিখিয়াছেন।

উদ্ধৃত হয়। ঐ পুস্তক ১৪৯৯ খৃঃ অব্দে মুদ্রিত হয়। "দান বাক্যাবলী" ও গয়াপতন নামক পুস্তক দুই খানিও বিদ্যাপতির লিখিত। ঐ দুই পুস্তক মিথিলার ভিন্ন অন্য কোথাও দৃষ্টি গোচর হয় না।

বিদ্যাপতিকে আমরা কবি ও সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারি না। তিনি একজন দার্শনিক পণ্ডিত ও ছিলেন। তাঁহার রচিত "বিবাদ সার" নামক পুস্তক, দার্শনিক ও নৈয়ায়িকের উজ্জ্বল মণি। কেহ কেহ বলেন কবিও দার্শনিক এক ব্যক্তিতে সম্ভবে না। কিন্তু ইহা যে প্রকৃত নহে তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত "নৈষধ" প্রণেতা সংস্কৃত কবি শ্রীহর্ষ। * তিনি একাধারে কবি ও দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। ঐরূপ একাধারে উভয় বিষয়ে পণ্ডিত্যের নাম আরো শুনা যায় যথা, আকবর বাদশাহের রাজকবি বিখ্যাত "ফৈজি" ও একজন দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন, তিনি অঙ্ক-শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। লীলাবতী নামক অঙ্ক শাস্ত্রের পুস্তক তিনি অনুদিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশে ঐরূপ একাধারে উভয় গুণ বিশিষ্ট পণ্ডিত প্রায়ই দৃষ্টি গোচর হয় না। পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণ যথা জার্ম্মানির গেটে (Goethe) ফরাসী ভিক্টরহুগো (Victor Hugo) এবং ইংরাজ কবি মিল্টন (Milton) প্রভৃতি কবিগণ ও একাধারে কবিতার ও দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসা করিতেন।

শুনা যায় কোন কারণ বশতঃ দিল্লীর সম্রাট মিথিলার রাজা শিবসিংহকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা অপ্রকৃত নহে, কারণ তখনকার দিনে সামান্য কারণেও অনেক মান্যনীয় ও পদস্থ রাজা মহারাজা কারারুদ্ধ হইতেন তাহা ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়। *

যে কারণেই হউক রাজা শিবসিংহ কারারুদ্ধ হইলে, বিদ্যাপতি তাঁহার প্রতিপালক রাজার উদ্ধারার্থ দিল্লী গিয়াছিলেন। কথিত আছে বিদ্যাপতি কবিত্ব শক্তি-দ্বারা সম্রাটকে এমনি মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে তাঁহার কবিত্ব শক্তির পুরস্কার দিতে চাহিলে বিদ্যাপতি তাঁহার প্রতিপালকের কারা মোচন প্রার্থনা করেন। বলা বাহুল্য গুণগ্রাহী সম্রাট তাঁহার বাসনা তৎক্ষণাৎ পালন করিয়াছিলেন। এবং বিদ্যাপতিকে বিহারের অন্তর্গত বিসপী নামক একখানি গ্রাম জায়গীর দিয়াছিলেন। ঐ গ্রামে অদ্যাপি বিদ্যাপতির বংশধরেরা বাস করিতেছেন।

তখনকার পণ্ডিতগণের মধ্যে বিদ্যাপতি সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পদাবলীও সহৃদয় সমাজে পরম আদরণীয়. ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, স্বয়ং ভগবানাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব বিদ্যাপতির পদাবলী পাঠ করিয়া পরম আনন্দিত ও পুলকিত হইতেন, ইহা চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে।

আশাকরি যতদিন বঙ্গ ভাষার আদর থাকিবে, যতদিন বাঙ্গালী জাতি পৃথিবীতে একটীও বিরাজিত থাকিবে ততদিন বিদ্যাপতির নাম চিরস্মরনীয় থাকিবে তাঁহার যশোমুকুট ম্লান হইবে না।

শ্রীলালগোপাল মিত্র।

---

* শ্রীহর্ষের বিষয় বারান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

* ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে লিখিত আছে যে, মহারাজেন্দ্র বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্র নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর দিতে না পারায় কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।

জব্বলপুর নর্ম্মদা-প্রপাত।

—:০:—

১৯০৫ সালে কার্ত্তিক মাসে আমরা তিন বন্ধুতে নর্ম্মদা-প্রপাত দেখিব বলিয়া হাবড়া, বেঙ্গল নাগপুর গাড়ীতে উঠিলাম। নানারূপ কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকায় কলিকাতা হইতে প্রায় বাহির হইতে পারিতাম না। আজ যেন গাড়ীতে মাঠের হাওয়া লাগায় হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তখন হেমন্ত কাল। চারিদিকে শস্য-পূর্ণ প্রান্তর। সোণার বাংলা তখন তাহার অপূর্ব ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছে;—প্রান্তরের মাঝে মাঝে কাশপুষ্প বিকসিত হইয়া ধবলকান্তি ছড়াইতেছে। উপরে বিশাল-নির্ম্মুক্ত-আকাশ খণ্ড খণ্ড মেঘ লইয়া বড়ই সুন্দর সাজিয়াছে। যখন প্রায় সন্ধ্যা—চারি দিকে অস্পষ্ট আলোক ছড়াইয়া পড়িয়াছে তখন চক্রধর পুরের শৈলশ্রেণী আমাদের নয়ন-গোচর হইল। সন্ধ্যার ছায়ায় কালো কালো পাহাড় গুলি বড়ই গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল প্রান্তরবাহী উদ্দাম বায়ু আমাদের কাণে লাগি-তেছিল কত পুরাতনী কথা, কত ইতিহাস, কত অতীত গৌরবকাহিনী সে নিঃশব্দে আমাদের প্রাণে জাগাইয়া তুলিতেছিল। প্রকৃতি ক্রমে আরো গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বত-মালার পাদ দেশে-শস্য ভারাবনত মস্তক শস্য-রাজি সান্ধ্যসমীরচালিত হইয়া ভূমিচুম্বন করিতে করিতে যেন সন্ধ্যার আবাহন করিতে লাগিল। ক্রমে কৃষ্ণ শৈল শ্রেণীর সানুদেশে ঘনান্ধকার নামিয়া আসিল, পর্ব্বতশ্রেণী গম্ভীর নিস্তব্ধতা পাইয়া যেন মহাধ্যানে মগ্ন হইল—আমরা অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম। বাষ্পীয় শকট লৌহময় রাক্ষসের মত ধূমোদ্গীরণ করিতে করিতে অগ্রসর হইল।

রাত্রে গাড়ীতেই জলযোগ করিলাম। মনোহর পুরের প্রকাণ্ড "টনেল" পার হইয়াই আমার নিদ্রাকর্ষণ হইতে লাগিল। এমন মহাবিপদে আমি আর কখনও পড়ি নাই। চক্ষে ঘুম আসে, এদিকে গাড়ীর শব্দেও আন্দোলনে ঘুমাইবার অসুবিধা হইয়া যায়। যাহা হউক বহুকষ্টে একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল কিন্তু বেশীক্ষণ উপভোগ করিতে পারি নাই। কিঞ্চিৎ অধিক রাত্রে "রায়গড়" নাম শুনিয়া হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল। শুনিলাম সেখানে Fudatory chief আছেন। মনটা কেমন বিকৃত হইয়া গেল। "রায়গড় প্রতাপগড়ের কথা মনে আসিয়া অনেক গুলি ইতিহাসের ছবি আঁকিয়া দিয়া গেল। রায়গড়ের সহরটি ভাল শুনিলাম রাস্তাঘাট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্য ও খুব ভাল থাকে। যখন প্রভাত হইল তখন আমরা "ডুঙ্গর গড়" ষ্টেশনে পাহাড়ের গায়ে সুর্য্যোদয় দেখিয়া মন বড়ই পবিত্র হইল। সুর্য্যোদয় অনেকবারই তো দেখা যায় কিন্তু পাহাড়ের পার্শ্ব হইতে প্রভাত রবির রক্তচ্ছটায় প্রাণে যেন নবশক্তির সঞ্চার করে। সে সুন্দর দৃশ্য বুঝি জন্মে আর ভুলিব না। চতুর্দ্দিকে বিশাল প্রান্তর, পাহাড়ের তলদেশে শস্য-ক্ষেত্র গুলি যেন সুর্য্যোদয়ের সময় ঝলমল করিয়া উঠিল। প্রভাত বায়ু আসিয়া আমাদের রাত্রি-জাগরণ-ক্লিষ্ট শরীর শীতল করিতে লাগিল

এখান হইতে আমরা প্রাতঃকৃত্যের পর কিছু মিষ্টান্ন কিনিয়া জলযোগ করিলাম। তাহার পর বিশাল প্রান্তর ও শৈল-শ্রেণী দেখিতে দেখিতে বেলা ১০॥ টার সময় আমরা "গাগুয়া" ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। যাত্রার মুখে সহরটী ভাল দেখা হইল না। এখান হইতে একটা লাইন বাহির হইয়া জব্বলপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। আমরা Corresponding train এ উঠিলাম। অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল বলিয়া আমরা এখানে লুচি তরকারী কিনিলাম। খাইবার সময় সে ভয়ঙ্কর লুচি হাতে করিয়া ভয় করিতে লাগিল। একখানা লুচি বোধ হয় তিন ছটাক ভারী হইবে। আমি ও আমার আর একটী বন্ধু, দুইজনেই Dyspeptic ছিলাম; যাহা হউক ক্ষুধার তাড়নায় সেই লুচিই গলাধঃকরণ করিতে লাগিলাম। লুচির এরূপ আস্বাদ কখনও পাই নাই। একটু মিষ্ট বলিয়া বোধ হইল। পরে অনুসন্ধানে বুঝিলাম লুচি গুলি ভুটার আটায় তৈয়ারী। আমার আরও ভয় হইল। কিন্তু জলের গুণে আমরা কোনও অসুখ জানিতে পারিলাম না।

আমাদের গাড়ী এইবার সাতপুরা পর্ব্বত-রাজ্যে প্রবেশ করিল। এই লাইনটী বড়ই অপ্রশস্ত ও আশঙ্কাজনক কিছুদিন পূর্ব্বে এই লাইনটীতেই একটী ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছিল "গণ্ডিরা" ষ্টেশনে আমরা কয়েকখানা বিধ্বস্ত গাড়ী দেখিয়া আসিয়াছি, এখনও পর্য্যন্ত রেল-কোম্পানী সে রাস্তা মেরামত করেন নাই। বাস্তবিক যে স্থানে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল সে স্থানটী তখনও পর্য্যন্ত ভয়ানক ছিল। কয়েকখানি সমান্তরাল Slipper এর উপর দিয়া রেল পাতা হইয়াছে। কোনও প্রকার Pillar বা Supporter নাই। যদি একটু গোলমাল হয় তাহা হইলেই গাড়ী একেবারে ঝরণার জলে পড়িয়া যাইবে। যাহা হউক আমরা নির্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছিলাম।

এ অঞ্চলে স্ত্রীলোকেরা কাছা আঁটিয়া কাপড় পরে। আকৃতি গুলা অনেকটা রবিবর্ম্মার ছবিতে স্ত্রীলোকের আকৃতির মত, স্ত্রীসুলভ রমনীয়তা সত্বেও তাহাদের শরীর কষ্ট-সহিষ্ণু বলিয়া বোধ হইল। স্ত্রীলোককে ঘোড়ায় চড়িয়া পাহাড়ে উঠিতে কখনও দেখি নাই। এই দেখিলাম, স্ত্রীলোক গুলার গায়ে অসুরের মত বল। তাহারা যেরূপ প্রকাণ্ড গাছের ডাল একস্থান হইতে স্থানান্তরিত করিতেছে তাহাতে বোধ হয় যে তাহারা অনায়াসে আমাদের মত পুরুষকে আছাড়িয়া মারিতে পারে।

ক্রমে সন্ধ্যা নামিল। কালো পাহাড় গুলি সন্ধ্যার ছায়ায় আরো কালো দেখাইতে লাগিল এই সময় দূরে একখানা কালোমেঘ পাহাড়ের চূড়ার উপর চিকুর হাঁকিতেছিল, সে যে কি সুন্দর দৃশ্য তাহা বলিতে পারি না, জীবনেতো কখনও এমন পাহাড়ের রাজ্যে আসি নাই সব যেন নুতন বোধ হইতে লাগিল। পাহাড়ের রাজত্বে সন্ধ্যার শোভা দেখিয়া চক্ষু সার্থক হইল।

সারারাত্রি ধরিয়া আমাদের গাড়ী, সাতপুরা পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিল। রাত্রি নয়টার সময় আমরা নয়নপুর হইতে কিছু খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া পুনরায় গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী—

পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্য দিয়া নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ছুটিতে লাগিল। আমি সমস্ত রাত্রিই প্রায় জাগিয়া আছি। পাহাড়ের গায়ে জ্যোৎস্না খেলিতেছিল—সে বড় মধুর জ্যোৎস্না। যখন আমরা জব্বলপুর ষ্টেশনে নামিলাম তখন রাত্রি ৩টা, সারারাত্রি হিম ও উদ্দাম হেমন্ত বায়ুতে আমাদের বড়ই শীত করিতেছিল; গাছতলায় ঠাণ্ডা বেশী লাগিবে বলিয়া এবং ধর্ম্মশালায় ভদ্রলোকের থাকা অসম্ভব মনে করিয়া আমরা ষ্টেশনে সতরঞ্চ বিছাইয়া শুইয়া রহিলাম। প্রভাত হইতে না হইতেই সাহেবপুঙ্গব ষ্টেশন মাষ্টার আমাদের ঘ্যাঁক্ ঘ্যাঁক্ করিয়া আক্রমণ করিতে আসিলেন, তিনি আমার একটী বন্ধুর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—Get out you Babus, Station is not the Dharamshala. বন্ধুটী সাহেবপুঙ্গবের ভদ্রতায় বাধিত হইয়া ভালমানুষটীর মত "God bless you Sir," বলিয়া বোঁচকাবুচকী উঠাইয়া লইলেন, আমরাও তদ্রূপ করিলাম এবং রাস্তার একপাশে দাঁড়াইয়া আমাদের অভীষ্ট ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত শিউশঙ্কর লাল মহাশয়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরেই তিনি আসিলেন এবং আমাদের সৌজন্যে আপ্যায়িত করিলেন। তিনি জাতিতে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। ক্রমাগত দুই দিন গাড়ীতে কাটাইয়া, শরীর যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল; বড়ই স্নান করিতে ইচ্ছা হইল। শিউশঙ্কর বাবু আমাকে সাহেবদের স্নানাগারে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। আমি বড়ই বিভ্রাটে পড়িলাম, ভিতরে ঢুকিয়াই ত দেখি এক টেবিলের ধারে তিন সাহেব বসিয়া রহিয়াছেন—আমার ভয় হইল যে যদি তাঁহারাও আবার ষ্টেশন মাষ্টারের মত সৌজন্য দেখান। যাহা হউক ভাগ্যবশে তাঁহারা কোনও কথা কহেন নাই, চাপরাসী আমায় বাথরুমে প্রবেশ করাইয়া দিয়া Shower bath এর মুখ খুলিয়া দিয়া গেল। আমি জীবনে কখনও সাহেবদের স্নানাগারে স্নান করি নাই—বড়ই ফাঁপরে পড়িলাম। ঘরের মধ্যে একটা Porcelain এর reservoir আছে এবং একটা Tipod এর উপর আয়না চিরুনী ব্রস্ সাবান স্পঞ্জ ও তোয়ালে আছে। আমি ত কোনটাই ব্যবহারযোগ্য মনে করিলাম না, কেমন ঘৃণা হইতে লাগিল। যাহা হউক স্নান ত করিলাম—তৃপ্তি হইল না। শিউ শঙ্কর বাবুর বাসায় আসিয়া দেখিলাম যে তিনি আমাদের জন্য ভুট্টার লুচি গরমজিলিপী ও টাটকা দুধ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা আহার করিয়াই মারবেল রক্স দেখিতে মনস্থ করিলাম। সেদিন আর সহর দেখা হইল। মারবেল রক্স ষ্টেশন হইতে ১৪ মাইল। শিবশঙ্কর বাবু আমাদের একখানি "টোঙ্গা" ভাড়া করিয়া দিলেন। টোঙ্গা একপ্রকার গাড়ী অনেকটা ছাতরীওয়ালা এক্কার মত, চলিবার সময় বড় লাগে যাইতে দুই পাশে পর্ব্বতশ্রেণী বড় বড় গাছ, শস্যক্ষেত্র ও প্রান্তর দেখিতে দেখিতে চলিলাম। মাঝে মাঝে এক একখানি ছোট গ্রাম আমাদের চ'খে পড়িতে লাগিল। গ্রামগুলি বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেক গ্রামে তেলী, কুমোর, কামার, ধোপা, নাপিত, তাঁতী প্রভৃতি

পিজের নিজের ব্যবসা লইয়া আছে। প্রত্যেক গ্রাম খানিতে বোধ হয় ৩০।৪০ ঘরের অধিক প্রতিবাসী নাই অথচ তাহারা কেমন স্বাধীন—কেমন হাসি মুখ। সহরের সহিত সম্পর্ক রাখে না, অথচ তাহাদের কোন অভাব নাই। বেশ সুখে সস্থন্দে তাহারা ঘরকন্না করিতেছে। বলিষ্ঠ সুস্থকায় ছেলে-মেয়েগুলি আমাদের দিকে বিস্ময় সহকারে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। আমরা প্রান্তরবাহী পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিকে শস্যক্ষেত্র, শস্যরাজী শ্যামল-কান্তি ছড়াইয়া ভারতের চিরপ্রশংসনীয় উর্ব্বরতা শক্তির পরিচয় দিতে ছিল।

গম যবের ব্যবহার অধিক বলিয়াই হউক আর যে কারণেই হউক চাউল অপেক্ষা এদেশে গম ও যবের চাষ অধিক পরিমাণে হয়। নর্ম্মদা প্রপাত পৌছাইতে প্রায় দুই মাইল আছে এমন সময় একজন দেশওয়ালী Guide আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে লাগিল। আমরা তাহার খাতা দেখিলাম। টোঙ্গা আসিয়া "ভেড়া-ঘাট" নামক স্থানে থামিল। এইখান হইতে আমাদের পাহাড়ে উঠিতে হইবে।

যখন আমরা পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করি, তখন মধ্যাহ্নের সূর্য্যকিরণ সাতপুরা পর্ব্বত-মালায় বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। পাহাড়ের উপর খুব জঙ্গল, ব্যাঘ্রাদির উপদ্রব ও আছে; তবে এস্থানটীতে প্রায়ই মনুষ্য সমাগম হয় বলিয়া এবং সাহেবেরা মধ্যে মধ্যে শিকার করিতে আসেন বলিয়া দিনের বেলায় হিংস্র জন্তুর তত আশঙ্কা নাই। আমরা হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আর কতদূর।" সে বলিল—বেশীদূর নহে, আপনারা কি করিয়া যাইবেন? আমি বলিলাম যেমন করিয়া সকলে যায়, কোন গোলমাল নাই তো? হিন্দুস্থানী-না,—আমি বলিতে ছিলাম আপনারা গবর্ণমেন্টের নৌকায় Guide বলিল ঝরণা দিয়া দেখিতে যাইবেন, না আমার সঙ্গে একেবারে পাহাড়ের উপর উঠিয়া দেখিবেন? আমি বলিলাম—দুই রকম করিয়াই দেখিব" আগে পাহাড়ের উপর হইতে দেখি চল।

ক্রমশঃ

শ্রীনফর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিবেদন।—প্রেস পরিবর্ত্তন হেতু এবার পত্রিকা প্রকাশে কিছু বিলম্ব ও ত্রুটী লক্ষিত হইবে। পাঠক মহোদয় তজ্জন্য মার্জ্জনা করিবেন। পূজার অবকাশে যাঁহারা স্থানান্তরে যাইবেন, তাঁহারা যেন নিজ নিজ পোষ্ট অফিসে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের নোটীস দিয়া যান; সামান্য দিনের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন অসম্ভব। যাঁহারা এখন মূল্য প্রেরণ করেন নাই, তাঁহারা যেন দেয় সাহায্য সত্বর প্রেরণ করেন। আলোচনা যে এতদিন জীবিত রহিয়াছে, কেবল গ্রাহকগণের অনুকম্পাই তাহার প্রধান কারণ; অতএব অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের দেয় সাহায্য প্রদানে ইহার জীবন রক্ষা করিবেন। নতুবা আমরা সকলের নামে ভিঃ পিঃতে পত্রিকা প্রেরণ করিব, ইহাতে উভয় পক্ষেরই সুবিধা। কেহ ফেরৎ দিয়া যেন আমাদের ক্ষতি না করেন ইহাই নিবেদন।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

আগমনী।

—:০:—

শরতের ধোয়া চাঁদ   নীলিম গগণে মরি
ওই যে হাসিছে।

আনন্দে মুখর ধরা   কত শান্তি সুখ স্রোত
বহিয়া যেতেছে।

কল্ কল্ কল্ স্বরে   গাহিয়ে মঙ্গল গীতি
পুলকে তটিনী।

লইয়ে লহরী-মালা   মৃদুল গমনে মরি
চলেছে আপনি॥

অমিয় মিলন-ধারা   ঝরিয়া পড়িছে ওই
প্রকৃতির শিরে।

তাই বহুদূর হতে   প্রবাসী আসিছে ঘরে
বৎসরের পরে॥

মাতার ভ্রাতার সনে   পত্নি প্রাণপতি সনে
মধুর মিলিছে।

দেখিতে মায়ের মুখ   ভুলিয়া সকল দুখ
তনয় আসিছে।

স্নেহময়ী মা আমার   তোর আগমনী গীতে
জেগেছে ধরণী॥

স্নেহ বাহু পসারিয়ে   নেগো তোর কোলে তুলে
জগত জননী॥

বৎসরের পরে এলি   মা আমার—মা আমার
কি কহিব হায়।

এত কি কঠিন মাগো   তোরও হৃদয় খানি
পাষাণের প্রায়।

না দেখে মায়ের মুখ   নাহি পেয়ে স্নেহ সুখ
কাতর হয়েছে।

শত তাড়নায় দেখ   সকল হৃদয় গুলি
ম্লান হয়ে গেছে॥

অবিরাম মামা বলে   তিতি নয়নের জলে
লুটায়ে পড়েছে।

ভুলেছে পাষাণ সুতে   সহিতে পারে না আর
অসহ্য হয়েছে॥

মা তোরে সুধাই বল   কেন এত অভিমান
কোমল অন্তরে।

কি ত্রুটি দেখিয়া বল   অনাবিল স্নেহ হতে
রেখে দিলি দূরে।

বৎসরের পরে এলি   তিন দিন পরে যাবি
কেন মাগো চলে।

কে কোথা শুনেছে বল   ছাড়িয়ে কোলের ছেলে
মা থাকে গো ভুলে॥

হলে তিন দিন গত   মধুর মিলন তোর
হয়ে যাবে ক্ষীণ।

যাস্ না পাষাণী মেয়ে   মিলনে বাঁধিয়ে দিয়ে
থাক চিরদিন॥

মোরা সবে এক হয়ে;   রব তব পদতলে,
মনের হরিষে।

চাহিও অপাঙ্গে তবে   আমা সবাকার প্রতি;
জীবনের শেষে॥

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সুখ কৈ ?

—:•:—

কলনালী পাখী সুখী কল-বিতরণে ;
শিশু শিশু-নীর দানে, সুখ পায় মনে।
শশধর সুধাকরে, তাই সুখ তার ;
কুসুম সুবাস দানি লভে সুখ-ভার।
মানবের শ্রেষ্ঠ সুখ—বিভুর চরণে
পবিত্র নিঃস্বার্থ ভাবে আত্ম সমর্পণে॥

সোণার সংসার, অপার ঐশ্বর্য্য, কিন্তু চিত্ত সর্ব্বদাই সন্তপ্ত ; স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতি জগতের নয়নানন্দকর, মনোহারী ভালবাসার আনন্দ-নিচয় পরিবেষ্টিত হইয়া সাংসারিক নানাবিধ ভোগ সম্ভোগাদিও পূর্ণরূপে করা হইতেছে, কিছুরই অভাব নাই, কিন্তু হৃদয় অতৃপ্তি ও মনশ্চাঞ্চল্যের মুর্ম্মুর দাহনে প্রতিনিয়ত প্রজ্জ্বলিত। রসনার তৃপ্তিদায়ী লোভনীয় বহুবিধ ভোজ্য, চিত্তের হর্ষোৎপাদক বহুবিধ বিলাস-বৈভব, নেত্র তৃপ্তিকর সুরম্য সুবৃত্ত দৃশ্যাবলী, সকলই অবিরত সজ্জিত রহিয়াছে ; দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যা, চতুরাশ্ব সংযোজিত-দিব্য শকট, সর্ব্বদা নত শিরে আজ্ঞাপালন-নিরত, কর পুটে দণ্ডায়মান ভৃত্য, অবিরত কর্ণ যুগলে মধুবর্ষী স্বকীয় গুণ গাথা উদঘোষক চাটুবাদ নিপুণ পার্শ্বচর, সকলই প্রতিনিয়ত দৈহিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ সুখ সংবিধানের নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে. কিন্তু কই, মনে ত একটু ও সুখোৎপত্তি হইতেছে না। অশান্তির দাবদাহে যে হৃদয় পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতেছে, এ সকল ত তাহাতে বিন্দুমাত্র শান্তি সলিল সেচন করিতেছে না ; চিত্ত যে দুর্ব্বিষহ অবসাদ-ভারে প্রপীড়িত হইয়া পড়িয়াছে, এই সকল ত তাহাতে কণামাত্রও সজীবতার সঞ্চার করিতে পারিতেছে না। ধনে সুখ আছে ? আমার ত প্রচুর ধন রহিয়াছে, তবে আমার তাহাতে সুখোৎপত্তি হয় না কেন ? মানে সুখ আছে ? আমার ত জগৎজোড়াকীর্ত্তি গাথা,—আমি যে বিশ্রুত নামা—আমার যে মানের তুলনা নাই, তবে তাহা আমাকে একটুও সুখী করিতেছে না কেন ? যদি বল, মাতা, পিতা স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধবাদি হইতে পূর্ণ সুখের সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহাও বুঝি সত্য নহে ; আমার ত সকলই আছে,—মমতার প্রতিকৃতি স্নেহময়ী জননী ; পুত্র বৎসল, ধর্ম্মপ্রাণ পিতা ; কুল-প্লাবী জাহ্নবী-ধারাবৎ অনাবিল প্রেম-পূর্ণ-হৃদয়া, ভাবময়ী ভার্য্যা ; সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী প্রতি কার্য্যে সহায়ক প্রাণপ্রতিম ভ্রাতা ; জীবনের একমাত্র অবলম্বন, চরমের মৃত্যু সঞ্জীবনতুল্য প্রাণাধিক তনয়, আন্তরিক অনুরাগ পূর্ণ প্রেমময় বন্ধু বান্ধবাদি কিছুরই যে অভাব নাই, তবে আমি সুখী নই কেন ? আমার যে সকলই আছে, তবু চারিদিক শূন্য দেখি কেন ? ধন সম্পদ, যশ প্রতিপত্তি সকলই শ্মশানবৎ প্রতীয়মান হয় কেন ? সুন্দর, সুশোভন, বিশাল সোণার সংসার দগ্ধ-মরুভূমির ন্যায় অসহ্য উত্তাপ বর্ষণ করে কেন ? ফলতঃ এই সংসার হইতে বুঝি প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় না—তবে বুঝি, ধনে সুখ নাই, শুধু জনে সুখ নাই, বলে সুখ নাই, সম্পদে সুখ নাই, প্রভুতায়ও সুখ নাই। দুঃ

আমি কি ভ্রান্ত, এই সকল মিথ্যা, মায়াময়, আপাত-মনোহর-পরিণাম-বিষময় পার্থিব সম্পদ হইতে সুখের আশা করিয়াছি। আমি মরু ভূমিতে জল চাহিয়াছি। পাষাণ হইতে কোমলতা আকাঙ্খা করিয়াছি। শস্ত্রপাণি ক্রূর নির্দ্দয় নিষ্ঠুর হইতে অর্থ যাচঞা করিয়াছি অহো। তাই বুঝি এত অতৃপ্তি। হায়, তাই বুঝি এত বুকভরা গরলের তীব্র জ্বালা! আহা! তাই বুঝি দুশ্চিন্তা ক্ষোভ ও বিফলতার এত নিদারুণ পীড়ন। তবে কি সুখ মিলিবে না? এ সকলে যদি সুখ পাওয়া না যায়, তবে কি সুখ আর কপালে ঘটিবে না? জগতে কি তবে সুখ নাই? সুখ কি তবে এই পৃথিবীর কিছু নহে? কোথায় সুখ? সুখ কৈ সুখ কৈ? সুখ কি এই পাপতাপময় জগত হইতে চির বিদায় লইয়াছে? তবে বুঝি সুখ নাই? কিন্তু ইহাও ঠিক নহে, সুখ নিশ্চয়ই কোন গোপন রাজ্যে, অজ্ঞাতে অবস্থান করিতেছে—আমি তাহার সন্ধানই পাই নাই। সুখ নাই—ইহা ত ঠিক নহে। সুখ নিশ্চয়ই আছে। সুখ যদি নাই,—তবে ঐ নিশ্চিন্ত তাপসের বদন মণ্ডলে কিসের প্রসন্ন-হাস্য-জ্যোতি প্রতিভাত রহিয়াছে? সুখ যদি নাই,—তবে ঐ ধনহীন, জনহীন, সাহায্য বিহীন, সংসারের মান প্রতিপত্তি শূন্য, দুশ্চিন্তামুক্ত ভগবদ্ভাবুকের সর্ব্বাঙ্গে, বদন মণ্ডলে কিসের জ্যোতিঃর্ম্ময় প্রভা স্বর্গীয় দীপ্ত-মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে? সুখ যদি নাই,—তবে ঐ আড়ম্বরশূন্য, লতা পাতা মণ্ডিত পর্ণ কুটীরে, মানব কর্ত্তৃক ঘৃণিত, উপেক্ষিত, ধর্ম্মপ্রাণ দরিদ্রের অঙ্গনে কিসের মহামহোৎসবের দিব্য-শান্ত-মঙ্গল্য-জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইতেছে? সুখ যদি নাই,—তবে ঐ দারিদ্র্য-নিষ্পেষণ-পিষ্ট, ঈশ্বর-নির্ভর-শীল স্থির-মতি মানবের ক্লিষ্ট দেহে কিসের স্বর্গীয় ভাস্বর দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইয়া,মলিনতা, দরিদ্রতা, হীনতা ধ্বংস পূর্ব্বক স্বমহিমায় দীপ্যমান রহিয়াছে? সুখ যদি নাই,—তবে ঐ উন্মুক্ত প্রান্তরে নগ্ন দেহে শায়িত, ভগবৎ উৎসৃষ্ট প্রাণ যতিকে সন্দর্শন করিয়া—তাঁহার অনন্য সাধারণ শান্তি-দীপ্ত বদন মণ্ডল অবলোকন করিয়া, তাঁহার অনির্ব্বচনীয় প্রশান্ত চিত্ততা ও অক্ষুব্ধতা দৃষ্টিগোচর করিয়া, ভর্ত্তৃহরির তুল্য ভূপতি পর্য্যন্ত কোন্ মন্ত্রবলে বলিয়া উঠিয়াছিলেন ;—

"ভূঃপর্য্যঙ্কো নিজভুজলতা কন্দুকঃ খংবিতানং।
দীপশ্চন্দ্রো বিরতি বনিতালব্ধ সঙ্গ প্রমোদঃ।
দিকান্তাভিঃ পবন চমরৈর্ বীর্য্য মানঃ সমন্তাৎ।
যতিঃ শেতে নৃপইব ভুবি ত্যক্ত সর্ব্বস্পৃহোহপি।"

সুখ নাই ইহাও ঠিক নহে। সুখ আছে, কিন্তু তাহাত শুধু ধনধান, যশ, প্রতিপত্তি বাহ্য সুখধামে প্রাপ্তব্য নয়। তাহাত কোটী কোটী মুদ্রা বিনিময়ে কিনিতে পাওয়া যায় না। তাহাত অতুল বিভব প্রভাবে, কৃমি-কীট-পরিপূরিত ক্ষুদ্র ধন স্তুপের আড়ম্বরে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে সুখ কিসে? ধনে নয়,সম্পদে নয়, অতুল বিত্তে নয়। সুখ ধর্ম্মে, সুখ ঈশ্বর ভক্তিতে, সুখ ভগবানের কার্য্যে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনে। এ সুখের ত তুলনা নাই, এ সুখাপেক্ষা জগতে ত কিছুই স্পৃহনীয় নহে। ধর্ম্মে সুখ, অর্চ্চনীয় সুখ ও অখণ্ড শান্তি. তাই বুঝি ইংরেজ কবি কউপার গাহিয়াছেন :—

"Renounce all strength but strength devine;
And peace shall for ever be thine."

ধর্ম্মে সুখ—অতুলনীয়, অপার্থিব সুখ, ইহার একটু শান্তিময় আভা পতিত হইলেই সকল ভীতি, বিভীষিকা দূরীকৃত হইয়া সুখের সরল পথ মুক্ত হয়। তাই বুঝি স্বয়ং ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন " স্বল্পমপ্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" তাইবুঝি ধর্ম্মশীল হইয়া দরিদ্রও তাঁহার পর্ণকুটীরে রাজরাজেশ্বর, আর আমি অতুল বিভবের, অবর্ণনীয় ধন সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াও ধর্ম্মবিহীনতায় শ্রীভ্রষ্ট, সুখ বিরহিত, আশঙ্কিত। এতদিনে বুঝিলাম—আমার হৃদয়ে অশান্তির দাব-দাহ কেন? এতদিনে ভালরূপে জানিতে পারিলাম—ধন আমাকে সুখ দেয় না কেন? বন্ধুবান্ধব আনন্দিত করিতে পারে না কেন? অতুল বিষয়-সম্পদ তৃপ্তিদায়ী হয়না কেন? আমি যে ধর্ম্মের ঈশ্বর প্রেমের, রমনীয় ভক্তির সঞ্জীবনী সুধা সেচনে উহাদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারি নাই। এতদিনে বুঝিলাম, হৃদয়ের মধ্যে গভীর রূপে বুঝিলাম—ধর্ম্মছাড়া ধন নিষ্ফল, উহা মনুষ্যত্ব বিনাশের যন্ত্র, ধর্ম্মছাড়া বন্ধু বান্ধব বিফল—অনন্ত নরক পথের সহযাত্রী, ধর্ম্মছাড়া জাগতিক সুখ-সম্পদ সম্মান, প্রতিপত্তি শূণ্য, জ্ঞাননেত্রাবরোধক, অন্ধত্বের প্রধান উপাদান; ঈশ্বর প্রেম বিহীন, ধর্ম্ম সম্পর্ক রহিত ধন সম্পদে সুখ নাই, শান্তি তৃপ্তি তুষ্টি, পুষ্টি, এমনকি মানবতা ও নাই। দরিদ্র ধার্ম্মিক সর্ব্বাপেক্ষা সুখী, শান্তির অধিকারী, পৃথিবীর অধীশ্বর, তিনি দরিদ্র হইয়াও সম্রাট, গৃহবি রহিত হইয়াও অতুলনীয় প্রাসাদবাসী, গর্ব্বিত মানব সমাজ পরিত্যক্ত হইয়াও সমগ্র জগতের সবলা পূজ্য, অর্চ্চনীয়। পর্ব্বত তুল্য স্বর্ণ তাল জড় কর, অতুল সম্পদ বিভবের বিশালতায় পৃথিবী আচ্ছাদিত করিয়া ফেল, কোটী কোটী অশ্ব, গজ সৈন্য সামন্ত, পদ্মরাগ মরকত খচিত রাজমুকুট, শোভন উজ্জ্বল, মুক্তাজড়িত পর্য্যঙ্ক একত্রে সমাবেশ কর, স্বর্ণের পালঙ্কে গড়া গড়ি দাও, মাণিক্যের হার গাঁথিয়া কণ্ঠ দেশে দোলাইয়া রাখ কিছুতে সুখ নাই। দেখিবে ধর্ম্মছাড়া সেগুলি মৃতাস্থি, সেগুলি শ্মশানের কালিমাময় দগ্ধ অঙ্গার, সেগুলি পথিপার্শ্বে নিপতিত তৃণ গুচ্ছ হইতে অধিক মুল্যবান নহে। কিন্তু ঐযে বিভব-সম্পদ বিহীন ধর্ম্মভীরু দীন দরিদ্র কুটিরে বসিয়া স্বর্গীয় হাসিতে দিক আলকিত করিতেছেন, ঐখানেই যাবতীয় সুখের একত্র সম্মিলন, ঐ খানেই শান্তির মেলা, সুখের প্রস্রবণ। আজ চক্ষু হইতে মোহাবরণ খসিয়া পড়িল। আজ আমি উজ্জ্বল রূপে, স্পষ্টরূপে দেখিতে পইলাম-সুখ কই! বুঝিতে পারিলাম সুখের আবাস স্থল কোথায়? কোন্ স্বর্গীয় আলোক মণ্ডিত, দিব্য ভাবাপন্ন হৈমগৃহে সুখের জ্যোতির্ম্ময় পূণ্য পীট সংস্থাপিত রহিয়াছে, জানিতে পারিয়া আজ ধন্য হইলাম, চক্ষুষ্মান্ হইলাম। আজ আমার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে আত্ম প্রসাদ ও শান্তি, আনন্দ ও হর্ষের উৎস সহস্র ধারা নির্গমন পুর্ব্বক উৎসারিত হইয়া আমার সংসার দুঃখ-তপ্ত, পাপের কঠোর-স্পর্শ কলঙ্কিত, মর্ম্মন্তুদ শোক-ভার নিপীড়িত হৃদয়কে, অনাবিল স্বর্গানন্দে অভিষিক্ত করিয়া ফেলিল। শুষ্ক কাষ্ঠ মুঞ্জরিত

হইল হিমান্তে শীত-সঙ্কুচিত কুহেলিকা-আচ্ছাদিত বসন্তের আবির্ভাব হইল, কোকিল পঞ্চমে গাহিয়া উঠিল। আজ আমি সুখের সন্ধান পাইয়া ধন্য হইলাম, কৃতার্থ হইলাম। দেখিলাম-যিনি ত্রিজগৎব্যাপী, যিনি "সর্ব্বতঃ পাণি পাদং তৎ সর্ব্বতো হক্ষি শিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য" * অবস্থান করিতেছেন, যাঁহার দর্শন মাত্র" ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়া, ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" † তাঁহার পদতলে সুখ মাল্যাকারে গ্রথিত, সুখ পূর্ণ অখণ্ড সুখ, শাশ্বত, অপার্থিব, অপ্রমেয় সুখ বিজড়িত রহিয়াছে। হে সংসারের ধন ভারে প্রপীড়িত মানব, তুমি যদি ধনসম্পদে সুখান্বেষণে প্রধাবিত হইয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া থাক, এস, তোমাকে অনন্ত সুখের পন্থা বলিয়া দিব, তুমি চির সুখী হইবে। এস আজ কে সুখের অন্বেষণকারী, এস আজ কে ধন সম্পদ হইতে, বন্ধু বান্ধব হইতে, অতুল বিভব হইতে প্রকৃত সুখ পাইতে চাও এস, তোমাকে সুখের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি প্রদর্শন করিব। আর তুমি ধনহীন, দুঃখ জ্বালায় উৎপীড়িত, দীন দরিদ্র, তুমিও এস, ভয় নাই, তুমি সুখ চাহিতেছ, অর্থের মুখ দেখিয়া সুখী হইবে ভাবিতেছ কিন্তু শুধু অর্থের জন্ত ব্যাকুলতায়ত প্রকৃত সুখ মেলেনা, তুমি এস, তোমাকে সুখের প্রকৃত পন্থা দেখাইয়া দিয়া শাশ্বত সুখের অধিকারী করিব। ভগবানে সর্ব্বস্ব অর্পণ কর—সুখ মিলিবে, ভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে আত্ম বিসর্জ্জন কর, ধনিন তুমি সুখ পাইবে। আর দরিদ্র মানব তোমারও মনোবাধা দূরীভূত হইবে। ভগবানের অর্জ্জুনের প্রতি এইরূপ আদেশ আছেঃ —

"যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণং"।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা

যাহা কর, খাও, পান কর, দান কর, তপস্যা কর, সকল ভগবানেতে সমর্পণ করিয়া শুধু ভগবানের আদেশে তাঁহারই প্রদত্ত বিত্ত-বাদি ভোগ করিয়া সংসারে অবস্থিতি কর - তুমি সুখী হইবে। ইহাই একমাত্র সুখ—একমাত্র শাশ্বত সুখ—একমাত্র উপভোগ্য সুখ, জগতে অন্ত সুখ নাই। ধন সম্পত্তিতে ভগবানের আদর্শ স্থাপন করিয়া, বন্ধু বান্ধবের মধ্যে ভগবানের মহামহিমাময় বরণীয় মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া, স্ত্রী পুত্রাদিতে ভগবানের অনন্ত প্রেম, অনন্ত বাৎসল্য উপলব্ধি করিয়া, মাতা পিতার অনাবিল স্নেহের মধ্যে সেই প্রাণ মন-মোহনের মধুময় সত্ত্বা প্রণিধান করিয়া, সমস্ত জগতকে, সর্ব্বভূতকে ভগবানের দেহের বিস্তার মনে করিয়া, সুখে, দুঃখে, বিপদে বিষাদে, জীবনে মরণে, শ্মশানে নগরে, প্রেমময় বিশ্ব পিতার মঙ্গল্য আশীর্ব্বাদ অনুভব করিয়া, জগতে তাঁহার আদেশ পালন কর—তাহাতেই একমাত্র সুখ নিহিত। যদি জিজ্ঞাসা কর পৃথিবীতে সুখ কই? আমি বলিব পুনঃপুনঃ বলিব, তাঁহাতেই একমাত্র সুখ, তদ্ব্যতিরিক্ত আর সুখ নাই।

শ্রীভূপতি চরণ চক্রবর্ত্তী।

* শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। † মুণ্ডকোপনিষৎ।

প্রবাসী।

—•—

সংসার পথশেষে, প্রবাস ক্লেশবহ
অনন্ত পথ না ফুরায়।
জীবন পথ ধরি, এ মহা প্রান্তরে
প্রবাসী সুধু ছুটে যায়।
সবল বলহীন, কর্ম্ম-শিকল কাটি
স্বদেশ প্রয়াণে আশ।
ভগ্ন হৃদয় সুধু ব্যর্থ উদ্যম হেরি
নিঃশ্বাসে আত্মার ত্রাস।
সুদীর্ঘ পথশেষে আবার নব পথ
শত শত জন্ম ফুরায়;
বিস্তৃত প্রান্তরে সুধু পরিবর্ত্তনে
অনন্ত দিন কেটে যায়।

*   *   *

দূর প্রবাস ক্লেশ, শ্রান্ত হৃদয় তার
ক্লান্তি অলস বড় দেহ;
স্নেহ শীতল কর, মর্ষণ পুলকিত
শান্তি পিপাসী বড় সেহ;
দীর্ঘ প্রবাস বাস যাপিয়া এতদিন
এবে কি গো ফিরিছে ঘরে;
কিম্বা বিরাম ছলে, বিশ্রাম ক্ষণ সুধু
আবার প্রবাস তরে?
নশ্বর এই ধরা, নশ্বর সুখ তার,
নশ্বর দুদিন প্রবাস;
ক্ষুদ্র জীবন ব্যয়ে, দীর্ঘ জীবন পথে
জীবের উপকার আশ।

*   *   *

শতধা মলিন মুখ, ভীত ভীত চিত
ওই যে দাঁড়ায়ে দ্বারে।
এ নব জীবনে, আপন জন বলি
আদরে ডাক গো তারে।
বক্ষে লুকান কত, কাহিনী চিত্র,
মুখ ফুটে বলিতে না পারে;
শান্ত শীতল কর, শ্রান্ত কম্পিত তার
ডুবিয়া করুণার ধারে।
পাই' করুণা ধারা, উজ্জ্বল হোক তার
আননে স্বর্গের হাসি;
স্নিগ্ধ বকুল বেলা, বাস সরস্তি তহু,
ঢালুক পরিমল রাশি।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ।

পিডিয়ার যুদ্ধে বীরকুমার

জালিম সিংহের বীরত্ব।

——:•:——

বাঙ্গালার প্রিয় নবাব সুজা খাঁ পরলোক গমন করিলে তদীয় পুত্র সরফরাজ খাঁ বঙ্গ মসনদে আরোহন করেন. ইনি ইসলাম ধর্ম্মে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন, কিন্তু শাসন কার্য্যে তাদৃশ যোগ্যতা দেখাইতে পারেন নাই। ইহার পিতা সুজা খাঁ শাসন সৌকার্য্যে এক মন্ত্রী সভা গঠন করেন, এই সভার প্রধান সদস্য রায় রাঁইয়া আলম্ চাঁদ, জগৎ শেঠ, ফত্তে চাঁদ এবং হাজি আহম্মদ প্রভৃতি। এই সভার পরামর্শ ক্রমে রাজ্যের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদিত হইত। সুজা খাঁ মৃত্যুকালে পুত্র সরফ রাজ খাঁকে বলিয়া যান যে আমার অমাত্যগণের পরামর্শ লইয়া

শাসন কার্য্য সুসম্পন্ন করিবে, তাঁহাদের অমতে কোন কার্য্য করিবে না, কিন্তু যৌবন মদ-গর্ব্বিত সরফরাজ খাঁ তাহার পিতার মূল্যবান বাক্যগুলি পদ দলিত করিয়া ঐ সকল বিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে অপদস্থ-পদচ্যুৎ করিয়া অবজ্ঞাত করিলেন।

মর্দ্দান আলি খাঁ, হাজি লতিফ উল্লা খাঁ, মীর মর্ত্তূজা প্রভৃতি বাল্য সহচরগণকে উক্ত দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। মীর মর্ত্তূজা বয়সে যুবক হইলেও বৃদ্ধ হাজি আহম্মদের পদ লাভ করিল। কথিত আছে যে, হাজি আহম্মদ নাকি নবাব সুজা খাঁর জন্য বারবনিতা যোগাড় করিতেন, সেইজন্য নূতন নবাব তাহাকে দেখিতে পারিতেন না। * প্রকাশ্য দরবারে উক্ত কুৎসিত কথা তুলিয়া বৃদ্ধ হাজি আহম্মদকে অপদস্থ করিতেন। বিজ্ঞ হাজি আহম্মদ নবাবের প্রতি কৃত্রিম ভালবাসা দেখাইয়া ব্যয় সংক্ষেপ ছলে সৈন্য সংখ্যা কমাইতে উপদেশ দিলেন। নির্ব্বোধ নবাব তাহাই করিতে রাজি হইলেন।

এদিকে অতি সংগোপনে স্বীয় সহোদর মির্জ্জা মহম্মদ আলির নিকট তাহার প্রতি যে অত্যাচার হইতেছে লিখিয়া পাঠাইলেন। ভ্রাতা মহম্মদ আলি তখন বিহারের শাসনকর্ত্তা, তাঁহার অসীম ক্ষমতা। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কষ্ট শুনিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মুরশিদাবাদে দাম্ভিক নবাবকে সিংহাসন চ্যুত করিবার জন্য ঘোর ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। জগৎ শেঠ ফতে চাঁদ এবং হাজি আহম্মদ এই কার্য্যের নায়কতা করিতে লাগিলেন। অপর দিকে দিল্লীতে বাদসাহ দরবারের কর্ম্মচারী ইছাহাক খাঁকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নাজিমী পদের সনন্দ (ফরমান) সংগ্রহ করিলেন, এত ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল কিন্তু অলস-বিলাসী নবাব তাহার কিছুমাত্র তত্ত্ব জানিতে পারিলেন না, কেবল কামিনী (বারবনিতা) বেষ্টিত হইয়া ধ্বংশপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

মুরশিদকুলি খাঁর সময় রাজকোষের সাত কোটী টাকা জগৎ শেঠের নিকট গচ্ছিত ছিল, নবাব সরফরাজ খাঁ উক্ত টাকা প্রত্যর্পণের জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করায়, জগৎ শেঠ অতিশয় বিরক্ত হইয়া মহম্মদ আলির সাহায্য প্রার্থনা করেন। *

দিল্লী হইতে সংবাদ আসিল যে, তুমি সত্বর নবাব সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া তদ সিংহাসন দখল কর। মহম্মদ আলি কাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ মুরশিদাবাদ অভিমুখে অভিযান করিলেন। তখন পর্য্যন্ত নবাব সরফ রাজ খাঁ জানিতেন না যে, তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য গুপ্ত ষড়যন্ত্র হইতেছে। সহসা

* English translation of Sair *Motakharin by Haji Mostapha*, page 326—327.

* এই সম্বন্ধে অর্ম্মি ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ বলেন যে নবাব জগৎ শেঠের পুত্র বধূর সৌন্দর্য্য কাহিনী শুনিয়া তাহাকে স্বীয় প্রাসাদে আনয়ন করতঃ তাহাকে দর্শন করায় জগৎ শেঠ অতীব অপমান বোধ করিয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য মহম্মদ আলির স্মরণাপন্ন হন।

গিরিয়ার সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে মহম্মদ আলির রণ ভেরী বাজিয়া উঠিল।

নবাব এই সংবাদ পাইবামাত্র সাধ্যানুসারে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নবাব সৈন্যের অধিকাংশই জগৎ শেঠের বশীভূত হইয়াছিল। তাহারা অনিচ্ছা সত্বেও যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল কিন্তু তাহারা অনেকেই প্রকৃত যুদ্ধ করে নাই। যখন গিরিযার প্রান্তরে যুদ্ধ বাধিল, তখন অনেক সৈন্য পলায়ন করিল, ইহাতে নবাব কিছুমাত্র ভীত বা চিন্তিত হইলেন না। তিনি মহম্মদ আলিকে শিক্ষা দিবার জন্য স্বীয় সৈন্যগণকে পুনঃ পুনঃ উৎসাহিত করিয়া উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। আহতের আর্ত্তনাদ, অস্ত্রের ঝন ঝনানি, যুদ্ধাশ্বের হেস্রাধ্বনি, হস্তীর বৃংহিতে রণস্থল বীভৎসাকার ধারণ করিল।

নবাব সরফ রাজ খাঁ কেবল শক্র সৈন্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কিন্তু রণ বিদ্যা বিশারদ মহম্মদ আলি কৌশলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তখন তাঁহার হস্তীর মাহুত বলিল—হুজুর ! এখনো পলায়নের উপায় আছে আজ্ঞা করেন ত পলায়ন করি। ইহাতে নবাব বিরক্ত হইয়া বলিলেন, অগ্রসর হও, অগ্রসর হও। সহসা বিপক্ষের জলন্ত গোলা আসিয়া নবাবের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া চলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জৈবী লীলার অবসান হইল।

এই যুদ্ধে নবাব সরফ রাজ খাঁ এবং তদীয় প্রধান সেনাপতি গায়স খাঁ অপূর্ব্ব অসীম বীরত্ব দেখাইয়া বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। যখন নবাব মূর্চ্ছামুখে পতিত হন, তখন মুসলমান বীর গায়স খাঁ বিপক্ষ সেনাধ্যক্ষ নন্দলালের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি বাঙ্গালী বীর নন্দলালকে সংহার করিয়া যখন নবাবের সাহ-যার্থে আসিতেছিলেন, তখনই শুনিলেন যে নবাব শক্রর জলন্ত গোলকাঘাতে দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। বীরবর নিরুৎসাহ না হইয়া স্বীয় পুত্রদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, বাপ সকল! এস, আমাদের আশ্রয় দাতা—অন্নদাতা যে পথে গিয়াছেন আমারাও হয় অতুল বীরকীর্ত্তি দেখাইয়া সেই পথে যাইব, কিম্বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিব। নির্ভীক সেনাপতি গায়াস খাঁ প্রিয়তম পুত্রদ্বয় সহ রণক্ষেত্রে ঝম্প প্রদান করি-লেন এবং রণক্ষেত্রে অসংখ্য বিপক্ষ সৈন্য হত করিয়া পুত্রদ্বয় সহ অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিয়া প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠ প্রদর্শন করাইলেন। এই ভীষণ যুদ্ধে নবাবের বহু সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল। উভয় পক্ষে হিন্দু মুসলমান বীরগণ স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করতঃ চিরনিদ্রায় শয়ন করেন, তাহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় বীর বিজয় সিংহ অন্যতম। ইনি নবাব সৈন্যের পৃষ্ঠ দেশ রক্ষণ করিতেছিলেন ইহার সঙ্গে তস্য নবমবর্ষীয় পুত্র জালিম সিংহ রণ ক্ষেত্রের ভৈরব তাণ্ডব দেখিতে আসিয়া-ছিলেন। ইহা অবশ্য ক্ষত্রকুলের রীতি যে, রণ ক্ষেত্রের অমানুষিক কাণ্ড দেখিয়া ক্ষত্রিয় বালক গণ সুদূর ভবিষ্যতে নির্ভীক হন।

সে যাহা হউক যখন নবাবের ভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত হইল, তখনই নির্ভীক বিজয় সিংহ শক্রর ভীষণ গোলাঘাতে ধরাশায়ী হইলেন। সে সময় গিরিযার প্রান্তর রক্ত রঞ্জিত হইয়

ভীষণ হইতে ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে—বিজয় সিংহের পতনের সঙ্গে সঙ্গে নবাব সরফ রাজ খাঁর সকল গৌরব চির তরে ভস্মীভূত হইয়াছে।

সমর বিজয়ী মহম্মদ আলি বিজয়োল্লাসে মত্ত হইয়া পলায়মান শত্রু সৈন্যের পশ্চাদধাবন করিতে লাগিলেন।

বীরবর বিজয় সিংহের পতন দেখিয়া তদীয় আত্মজ বীরকুমার জালিম সিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পিতৃ পরিত্যক্ত তরবারি লইয়া ক্ষুদ্র হস্তে অসি সঞ্চালন করিয়া শব দেহের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই স্থানে শত্রু সৈন্যগণকে দেখিয়া সিংহ-বিক্রমে বলিয়া উঠিলেন যে, আমার পিতার মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া অপবিত্র করিবে, তাহাকে আমার এই সুতীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে শমন সদনে যাইতে হইবে। সিংহ শাবক যেমন আততায়ী দেখিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক শত্রুর ভীতি উৎপাদন করে, নবম বর্ষীয় বীর কুমার জালিম ও তাহাই করিতে লাগিলেন। বালক হইলেও সাহসে অতুল, অসীম নির্ভীক বীর পুরুষ। কখনো তরবারি সঞ্চালন করিয়া শত্রুকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, কখনো ভূগর্ভস্থিত ভুজঙ্গের ন্যায় সরোষে গর্জ্জন করিয়া স্বীয় বিশাল বিক্রম দেখাইতে লাগিলেন। কুমার জালিম সিংহকে মহম্মদ আলির সৈন্যগণ যখন বেষ্টন করিয়া ফেলিল, তখন বীরবালক বীরতেজে অনুপ্রাণিত হইয়া ক্ষুদ্র হস্তে অসি ঘুরাইয়া বলিলেন—আয় দুরাত্মা গণ! তোদের সমর সাধ মিটাইয়া দিই।

মহম্মদ আলি দূর হইতে এই হৃদয় বিদারক করুণ মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং সৈন্যগণকে নিবৃত্তি হইবার জন্য সঙ্কেতধ্বনি করিলেন। সৈন্যগণ থামিল, তিনি নিকটস্থ হইয়া বলিলেন;—বালক স্থির হও। ভয়শূন্য বীরবালক জালিম সিংহ বলিলেন,—সেনাপতি! ক্ষত্রিয় বালক, বীরবালক, সিংহ শাবক, সে কি রণক্ষেত্রে স্থির থাকিতে পারে। যদি ইচ্ছা হয়, সাধ থাকে, তবে আসুন উভয়ে যুদ্ধ করিয়া অদম্য সমর আকাঙ্ক্ষা মিটাই, আমি আপনার বিপুল সৈন্য দেখিয়া ভীত নহি।

বীর বীরের মর্ম্ম বুঝে, সমর-শাস্ত্র-বিশারদ মহম্মদ আলি বলিলেন,—বাবা স্থির হও, শান্ত-ভাব ধারণ করিয়া তোমার বক্তব্য বল, আমি তদনুসারে কার্য্য করিব। বালক পূর্ব্ববৎ ভীম গর্জ্জনে আস্ফালন করিয়া উত্তর দিলেন—সেনাপতি! যে কেহ আমার অমতে আমার পিতার মৃতদেহ স্পর্শ করিবে, তাহার মস্তক আমার অসি ধারায় বিখণ্ডিত হইয়া ধরণীবক্ষঃ চুম্বন করিবে। বালকের অমানুষিক বীরত্ব মহম্মদ আলির ও তদীয় সৈন্যগণের মনমুগ্ধ করিল। তাহারা বালকের বীরত্ব দেখিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। যখন তাহারা বালকের জন্য অশ্রু বর্ষণ করিতে ছিল, তখন জালিম সিংহ ধীর-স্থির-গম্ভীর ভাবে নিশ্চল পাষাণবৎ পিতার মৃতদেহের নিকট অসি হস্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মহম্মদ আলি বালককে শান্ত করিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন যে, বাপ! আমি আমার হিন্দু কর্ম্মচারীর দ্বারা তোমার পিতার দাহকার্য্য করাইব,

আমি আমার নামে ইহা প্রতিশ্রুত হইলাম। তখন বীরকুমার জালিম সিংহ অশ্রুবারি ফেলিয়া পিতার চরণ যুগল ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার কান্না দেখিয়া বিপক্ষ শত্রুগণও অশ্রুপাত করিতে লাগিল। তৎপর মহম্মদ আলির হিন্দু কর্ম্মচারীরা কেহ মৃতদেহ,কেহ বা বালক জালিম সিংহকে স্কন্ধে করিয়া ভাগিরথী তীরে লইয়া গেল এবং হিন্দু রীত্যানুসারে দাহকার্য্য করিল। বীরবালক জালিম সিংহ ভাগিরথী তীরে নয়ন জলে পিতার পারলৌকিক তর্পণ করিয়া পিতৃ-ভক্তির চরম স্মৃতি রাখিল। * বালক জালিম চলিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার বীরকীর্ত্তি ইতি-হাসের পৃষ্ঠায় জলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। ধন্য রাজপুত জাতি! ধন্য বিজয় সিংহ !! ধন্য বীরবালক জালিম !!! তোমার মত এক চন্দ্রেই জগৎ আলোকিত হয়। আমরা তোমার রমণীয় চিত্র মানসপটে অঙ্কিত করিয়া সুখানুভব করিয়া থাকি। তাই আবার বলি, ধন্য বালক-রূপী সিংহপুরুষ। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে গিরিযার যুদ্ধাবসানে মহম্মদ আলি আলিবর্দ্দী খাঁ নামধারণ পূর্ব্বক বাঙ্গালার রত্নময় সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

শ্রীপ্রমথনাথ সরকার।

---

* উক্ত ঘটনা সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেন তাঁহার (সায়রমুতাক্ষরীনে) লেখেন নাই। কিন্তু গোলাম হোসেন সালিম সৈয়দপুরী তাঁহার 'রিয়াজু সেনাতিন" নামক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। তজ্জন্য শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় মহাশয় মুর্শিদাবাদ কাহিনীতে ১২০ পৃষ্ঠায় উক্ত ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন।

জব্বলপুর—নর্ম্মদা-প্রপাত।

২

—:০:—

আমরা পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। আহা, কি শান্তি! কি আনন্দ! প্রকৃতির মনোরম শোভা দেখিয়া আমরা সূর্য্যকিরণের প্রখরতা অনুভব করিতে পারি নাই; আমরা পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে মাঝে মাঝে শ্যামল সমতল-ক্ষেত্র পাইতে লাগিলাম এবং মাঝে মাঝে আবার পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিকে নিরবচ্ছিন্ন, ঘন-পল্লব-সমন্বিত মহাদ্রুমরাজির কৃষ্ণকান্তি দেখিতে দেখিতে আমরা অনেক উপরে উঠিলাম। যত উপরে উঠি, তত অধিকসংখ্যক পর্ব্বতচূড়া দেখিতে পাই, সে এক পাহাড়ের মহাসমুদ্র—যেদিকে চাই—সেইদিকেই পাহা-ড়ের চূড়া,—যেন নীল সমুদ্রে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিয়া মহাশূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে। এমন উদার আকাশ, এমন শ্যাম কান্তি—এমন পবিত্র গাম্ভীর্য্য আর কখনও দেখি নাই। চারিদিকে কত পুরাতন পাহাড় অতীতের সাক্ষ্যরূপ দণ্ডা-য়মান রহিয়াছে—তাহারা যেন বলিয়া দিতেছে "অল্পায়ু মানব! বৃথা অহঙ্কার করিও না। এক-বার তোমার ক্ষুদ্রত্ব বিচার কর! এই দেখ আমরা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চারি যুগ এইখানে উন্নতমস্তকে অবস্থিতি করিতেছি; জগতে কত পরিবর্ত্তন দেখিয়াছি—কত মহাত্মার পদধূলিতে এইস্থান পবিত্র হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু দেখ এখন কিছুই নাই—সব কালগর্ভে লীন হইয়াছে। মূর্খ মানব, তুমি ইতিহাস—

গৌরব কর? যে ক্ষুদ্র মানব পলকে পরমাণুতে মিশাইয়া যায়, তাহারই অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনা পুস্তকাকারে তোমাদের মনোরঞ্জন করে? আমার দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে যে আমার প্রত্যেক পরমাণুতে কত ইতিহাস রহিয়াছে। সৌন্দর্য্যের আদর কর? একবার আমার বুকে উঠিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ কর দেখি, এত প্রাণজুড়ান শোভা আর কোথাও আছে কি? তুমি প্রেমিক? আমার মত একবার কঠিন বস্তু আদরে হৃদয়ে ধর দেখি? তুমি স্বার্থত্যাগী? আমার মত একবার কঠিন বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে জগতের কল্যাণ কামনায় জল ধারা ঢাল দেখি?হায়, ভ্রান্ত জীব! স্থির হও। এখনো তোমার শিখিতে অনেক বাকী।"

ক্রমে আমরা নর্ম্মদাপ্রপাতের নিকট উপস্থিত হইলাম। এখানে আবার একখানা পাথর হইতে আর একখানা পথরে লাফাইয়া যাইতে হইবে। এইরূপে লাফাইয়া লাফাইয়া অনেকগুলা পাথর পার হইলে তবে প্রপাতের খুব নিকটবর্ত্তী হইতে পারিব। আমি তো বড়ই বিপদে পড়িলাম—এরূপ পাথর লাফাইতে লাফাইতে একটু পদস্খলন হইলেই হাড় চূর্ণ হইয়া যাইবে। যাহা হউক, অতি কষ্টে অতি সাবধানে পাথর গুলি পার হইলাম—পায়ের এক জায়গায় ছিঁড়িয়া গেল।

আমরা প্রপাতের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের গায়ে জলকণা আসিয়া লাগিতে লাগিল। প্রভাত-শীকর-সম্পৃক্ত বায়ুতে আমরা প্রখর সূর্য্যকিরণে দাড়াইয়াও শৈত্যানুভব করিলাম। কি সুন্দর দৃশ্য! কি মধুর পবিত্রতা! ভয়ঙ্কর কল কল শব্দ করিয়া জলরাশি প্রায় ২০০ শত ফীট নীচে পড়িতেছে, তুলা রাশির ন্যায় শ্বেত ফেনপুঞ্জের সহিত জল রাশি উচ্ছালিয়া উঠিতেছে। একটী প্রস্তর হইতে অপর প্রস্তরে লাফাইয়া, হেলিয়া দুলিয়া উঠিয়া নামিয়া উপলবিষম রেখা ঘূর্ণাবর্ত্তের সহিত সাগরোদ্দেশে ছুটিতেছে। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম। আশা আর মিটে না—নয়নের দেখিবার আকাঙ্খা আর ঘুচে না। কতক্ষণ এইরূপে দেখিয়া আমরা নৌকায় করিয়া বেড়াইতে মনস্থ করিলাম।

পাহাড়ের উপরেই "ডাক বাঙ্গলা" আছে। আমরা সেখানে নৌকা ভাড়া করিয়া স্রোতের উপর দিয়া অনেক দূর চলিলাম। এই স্রোতের মধ্যে হোলকার বাহাদুরের স্থাপিত শিবলিঙ্গ আছে। স্রোতের টান খুব বেশী। এই স্রোতের মধ্য হইতে আমরা শিবলিঙ্গের মস্তক দেখিতে পাইলাম। স্রোতের বেগ এত বেশী যে আমাদের নৌকা বিপরীত দিকে অতি কষ্টে গমন করিতে লাগিল। স্রোতের মধ্যে মধ্যে নানারংএর উচ্চ প্রস্তর উঠিয়াছে। যদি কোন রকমে একবার দাঁড়টানা বন্ধ হয়, কিম্বা যদি একবার দাঁড়ী মাঝীরা একটু ক্লান্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে আমাদের নৌকা একেবারে প্রস্তরগাত্রে আছাড়িয়া পড়িবে ও আমাদিকে খুজিয়া পাওয়া যাইবে না।

আমরা অনেক দূর এইরূপভাবে গেলাম। কত নীল শ্বেত পীত পাটল প্রস্তররাজি মাথা তুলিয়া রহিয়াছে, তাহা বলা যায় না। এক জায়গায় কতকগুলা পাথরের মধ্যে জল বড়

স্থির ছিল। আমাদের নৌকা সেইখানে ধরিল। আমরা (মারবেলরক)এর উপর উঠিয়া কতকগুলি নর্ম্মদার প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিলাম। এই খানে অনেক ছোট ছোট গর্ত্ত আছে, তাহাতে ছোট ছোট পাথর পড়িয়া জলের সংঘর্ষে কেহ বা বাণলিঙ্গ কেহ বা শালগ্রাম হইয়া আছেন। প্রায় ৩০০ ফিট উপরে একজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন—দেখিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম এখানে অনেক যোগী সন্ন্যাসী ছিলেন, পরে মনুষ্যসমাগমে তাঁহারা দণ্ডকারণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। দণ্ডকারণ্য নর্ম্মদার অপর পার হইতেই এক প্রকার আরম্ভ হইয়াছে।

আমরা ফিরিয়া ডাক বাঙ্গলায় আসিলাম। নিকটেই মহর্ষি ভৃগুর আশ্রম। কথিত আছে এইখানে তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তপস্যার উপযুক্ত স্থানই বটে। এখানে দাঁড়াইয়া একবার চারিদিক চাহিলে ভগবানের অচিন্ত্য মহিমার কথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না।

ফিরিয়া আসিতে আসিতে আমরা একটী সাহেবের সমাধিস্তম্ভ দেখিলাম। এমন নির্জ্জন পাহাড়ের উপর কেবলমাত্র একটী সাহেবের সমাধিস্তম্ভ দেখিয়া আমাদের কৌতূহল হইল। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জানিলাম যে সাহেব শিকার করিতে আসিয়া মৌমাছির চাকে গুলি মারেন, তাহাতে মৌমাছির কামড়ে সাহেবের মৃত্যু হয়। পাহাড়ের উপর বসুমাতার ও রাজা শালিবাহম নির্ম্মিত চৌষট্টি যোগীনীর মন্দির আছে। এই মন্দিরের সেবায়ত ব্রাহ্মণ পাহাড়ের উপরেই থাকেন। আমরা মন্দিরে উঠিলাম। মন্দিরের ১০৮টী সিঁড়ি আছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে গৌরীশঙ্করের প্রতিমূর্ত্তি আছে ও চতুর্দ্দিকে প্রাচীরের গায়ে চৌষট্টি যোগিনীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। প্রতিমূর্ত্তিগুলির বড়ই শোচনীয় অবস্থা। তাহাদের মধ্যে কোনটার ঘাড় নাই, কোনটার হাত, কোনটার পা নাই। আমরা সমস্ত দেখিয়া টোঙ্গায় আসিয়া বসিলাম। টোঙ্গা ফিরিতে আরম্ভ করিল। রাস্তায় আসিতে আসিতেই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। আমরা প্রান্তরে জ্যোৎস্নার খেলা দেখিতে দেখিতে শিউশঙ্কর বাবুর বাসায় ফিরিলাম। ভদ্রলোক যে বাসায় থাকেন, সেখানে শুইবার অসুবিধা বুঝিয়া আমরা সামান্য জলযোগ করিয়া কেলনার কোম্পানীর গুদামে শুইয়া রহিলাম। সে স্থানটী অনাবৃত নহে—তবে দক্ষিণ পশ্চিম দিক খোলা। আমরা সেইখানেই হেমন্ত রাত্রি কাটাইতে মনস্থ করিলাম। রাত্রে ভয়ানক ঝড় ও বৃষ্টি হইতে লাগিল। আমি অলষ্টার মুড়ি দিয়া ও বন্ধু কয়টী কাঠের উপর শুইয়া লেপ মুড়ি দিয়া এক প্রকার শীত রাত্রি কাটিয়া গেল। তবে সে রাত্রে কাহারও ভাল নিদ্রা হয় নাই।

প্রভাতে উঠিয়া জব্বলপুর সহর দেখিতে বাহির হইলাম। সহরটী বড় সুন্দর, রাস্তাগুলি বড় সুদৃশ্য। বাড়ী গুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; দুই একজন বাঙ্গালী ভদ্র লোকের বাড়ী ও দেখিলাম। মুসলমানের সংখ্যা অধিক বলিয়া বোধ হইল। সহরে প্রবেশ করিতেই একটী ফোয়ারা দেখিতে পাওয়া যায়, বাজারের নিকট একটী সুন্দর নগরতোরণ

আছে। এখানকার মুসলমানেরা বড় সভ্য, আমরা বিদেশী বাঙ্গালী দেখিয়া, মুসলমানেরা রাস্তায় দেখিলেই আমাদের অভিবাদন করে। আমরা আশ্চর্য্য হইলাম। এরূপ সভ্যতা অন্য কোনও জাতির আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।

সহরে একটী নাগপুরী ব্রাহ্মণের হোটেল আছে —আমরা কায়মনে সে দিন সেখানেই আহার করিলাম। ইহাদের হোটেলের দুই রকম আহার্য্য—ভাত ও রুটী। আমরা তাহাই খাইলাম। ভাতের সহিত ইহারা দুই প্রকারের ডাল, তরকারী ঘৃত ও লঙ্কার বাটনা দেয়। আমরা সেদিন আহারে অনেকটা তৃপ্তি বোধ করিলাম। তাহার পর আমরা একখানি টোঙ্গা ভাড়া করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। শিউশঙ্কর বাবু আমাদের স্নান ও আহারাদির ব্যবস্থা করিতেছিলেন, আমরা নিষেধ করিলাম। সেই দিনেই আমি ও একটী বন্ধু বাড়ী ফিরিতে মনস্থ করিলাম। অপর বন্ধু চুনার যাইবার জন্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেইখানেই থাকিবেন স্থির হইল। মধ্যাহ্নে শিউশঙ্কর বাবু ও চুনার যাত্রী বাবুটী আমাদের গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন। আমরা ফিরিতে আরম্ভ করিলাম। শিউশঙ্কর বাবু আমাদের ভদ্রতায় বাধিত করিয়াছিলেন। আমরা যখন তাঁহার নিকট যাই, তখন তাঁহার জর হইযাছিল। তাঁহার অসুস্থতা সত্ত্বে ও তিনি যেরূপ আমাদের যত্ন করিয়াছেন তাহাতে আমরা তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। জব্বলপুর হইতে ফিরিতে ফিরিতে আমরা সন্ধ্যার সময় নয়নপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে একটী বাঙ্গালী বাবু আদর অভ্যর্থনায় দ্বারা আমাদের যথেষ্ট আপ্যায়িত করেন। তিনি এই নাগপুরীর দেশে একা আছেন। প্রায়ই বাঙ্গালী দেখিতে পান না। আমাদের এক রাত্রের জন্য সঙ্গী পাইয়া তিনি অনেক কথাই কহিয়া ফেলিলেন।

আমরা সে রাত্রি নয়নপুরেই রহিলাম। রাত্রে আমার সঙ্গী বন্ধুটি এবং ম্যানেজার দুই জনেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। যদিও রাত্রে খুব হিম পড়িতেছিল এবং বাতাসও খুব জোরে বহিতেছিল তবুও গাড়ীর কষ্টের জন্য আমার কিছুতেই ঘুম হইল না। আমি বাহিরে আসিয়া প্রান্তরের একটি শিলাখণ্ডে বসিলাম। সেদিন কোজাগর পূর্ণিমা, জ্যোৎস্নায় সমস্ত প্রান্তর হাসিতেছিল। জ্যোৎস্না এত পরিস্ফুট যে আমি তাহার আলোকে কিছু দূরের বায়ু কম্পিত শস্য রাজি দেখিতে পাইতেছিলাম এবং প্রান্তর ব্যাপী শ্বেতপুষ্পের ধবলতা আমার নয়নে স্পষ্ট অনুভূত হইয়াছিল। কি মধুর বায়ু। কি মনোহর দৃশ্য—কি স্থির প্রকৃতি, লিখিবার কিছু নাই। সেই বিশাল প্রান্তরে সেই নিভৃত রাজ্যের মধ্যে কোজাগর পূর্ণিমা না দেখিলে লিখিয়া বুঝাইবার উপায় নাই।

যেখানে আমি বসিয়াছিলাম তাহার অনতি-দূরেই একটি ক্ষুদ্র শৈল ছিল। তাহা হইতে একটি ক্ষীণা নির্ঝরিণী প্রান্তর বাহিয়া ছুটি-য়াছে। বড় সুন্দর, সেই জ্যোৎস্নাময়ী নিস্তব্ধ হেমন্ত প্রকৃতি—বড় সুন্দর। নদীর গানের ভাষাতো কখন শুনি নাই, আজ যেন নদীর কল-তানে অনেক হারাণ কথা পাওয়া গেল। এক

একবার একটা উদ্দাম বায়ু আসিয়া প্রকৃতির যেন জড়তা দূর করিতে লাগিল। কোথায় চাহিব—কোন দিকে দেখিব? যে দিকেই চাই, সেই দিকেই যেন চৈতন্যরূপিনী প্রকৃতিকে দেখিতে পাই—ইচ্ছা হইল যেন নিজে শত শত অংশে বিভক্ত হইয়া প্রকৃতির কোলে মিলাইয়া যাই—প্রকৃতির প্রিয়কবির দুই একটি লাইন মনে পড়িল ভাবিলামঃ—

"To her fair works did Nature like,
The human soul that through me ran,
And much it grieved my heart to think,
What man has made of Man."

এত শান্তি! এত পবিত্রতা! আমি যেন স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করিতেছিলাম।

সেইদিন প্রাতে আমরা গ্রাম দেখিতে বাহির হইলাম। নয়নপুর গ্রামটিতে একটিও বাঙ্গালী বা অন্য কোনও জাতি দেখিতে পাইলাম না। কেবল মাঠের মধ্যে ক্ষুদ্র বাজারটিতে দুই একজন মাড়োয়ারী ব্যবসা করিতেছে মাত্র। রেলওয়ে কোয়াটারে একজন বাঙ্গালী ডাক্তার আছেন এবং দুই একটি মুসলমান কর্ম্মচারী সেইখানে বাসা করিয়া আছে। জল বায়ু তত স্বাস্থ্যকর নহে। এখানে এই পর্ব্বত রাজ্যে, এই ভীল কোল প্রভৃতি অসভ্য জাতির দেশে একটি মদের ভাটি আছে। আমরা একখানা ডিঙ্গিতে চড়িয়া ছোট নদীটি দিয়া কিছুদূর গিয়াছিলাম। এই অপ্রশস্ত নদীটির দুই পাশে অনেক ফুল ফুটিয়াছিল।

সেদিন আমরা হাট দেখিতে গেলাম। হাটে শাক-সবজি ফলমূল নানাপ্রকার বস্তু ছিল। কিন্তু কিছুই প্রায় দেখিবার উপায় নাই, সমস্ত জিনিসই চাপা। কি আছে জিজ্ঞাসা করিলে কে[illegible] [illegible]র দিবে না।

আমার [illegible] [illegible]টি প্রয়োজন, সেটি আবরণান্তর হইতে [illegible] হাতে করিয়া উঠাইয়া লইতে হইবে। তবে বিক্রেতা আমার সহিত কথা কহিবে, নচেৎ নহে। এ এক নূতন পদ্ধতি।

আমরা অসময় ফিরিলাম এবং রাত্রে গাড়ীতে উঠিয়া যাত্রা করিলাম। প্রভাতে আমরা সঙিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ট্রেণ আসিতে অনেক বিলম্ব ছিল। আমরা সঙিয়া সহর দেখিতে বাহির হইলাম। সহরটী মন্দ নহে, অনেক মাড়োয়ারী চাউলের ব্যবসা করিতেছে। এখানকার জল বায়ু ভাল। ক্ষীর ও দুগ্ধ অত্যন্ত সুস্বাদু, সহরে একটিও বাঙ্গালী দেখিলাম না। বেলা নয়টার সময় আমরা ধরিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

শ্রীনফর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধর্ম্মের জয়।

—:o:—

(১)

ক্ষুদ্র গল্প।

সবে মাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। পাখী সকল কুলায় গমন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। রাখাল গোপালসহ গ্রামে ফিরিতেছে। গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। প্রকৃতি দেবী শান্তির কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। শুক

নিশার মৌন ভাব চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল।

পল্লী গ্রামে সন্ধ্যার পরই প্রায় কেহ পথে বাহির হয় না, তবে বিশেষ আবশ্যক হইলে বাটীর বাহির হইতে হয়। প্রায়ই বন্য জন্তু ও সর্পের ভয়! তাহা হইলে কি হয়, যাহার শিরে সর্পাঘাত হইয়াছে, তাঁহাকে অবশ্যই ওঝার সন্ধান করিতে হইবে।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত বলরামপুর গ্রাম এককালে খুব সমৃদ্ধিশালী ছিল, কিন্তু হায়! কালের বিষম গতিতে এমন তাহার শতাংশের একাংশ ও দৃষ্ট হয় না। কেবল কতক গুলা ভাঙ্গা বাড়ী তাহার পরিচয় দিতেছে। এখানকার প্রাচীন অধিবাসীগণের মধ্যে জমীদার ব্রজেন্দ্র কিশোর বসু মহাশয় এখনও জন্ম ভূমির মমতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই; বিষম ম্যালেরিয়ার প্রকোপে গ্রাম শ্মশান ভূমে পরিণত হইয়াছে, বাকি যাহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই ভয়ে জন্ম ভূমির মায়া ত্যাগ করিয়া অন্যান্য দূর দেশে প্রস্থান করিয়াছেন। গ্রামে এখন অধিকাংশ ইতর লোকের বাস। ভদ্র লোকের মধ্যে ত ঘর কায়স্থ ও ১ ঘর ব্রাহ্মণ আছেন।

বৃদ্ধ জমিদার ব্রজেন্দ্র বাবু রোগ শয্যায় শায়িত তাঁহার মধ্যম পুত্র কৃষ্ণ বাবু ডাক্তারের সন্ধানে গ্রামের পথ অতিক্রম করিয়া যে পথে গরিবপুর যাওয়া যায়, সেই পথে একাকী চলিয়াছেন। কারণ গ্রামে কোন ডাক্তার কবিরাজ পাওয়া যায় না। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদিও একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, তথাপি একজন বহুদর্শীর পরামর্শ লওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন।

কৃষ্ণ বাবু অৰ্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে মানবের গোঙানী শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। পর দুঃখ কাতর যুবক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেইদিকে যাইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে একটী ছোট কুটীর তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইল, তিনি কুটীরের যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, শব্দ ততই স্পষ্ট হইতে স্পষ্ট তর শ্রুত হইতে লাগিল, তিনি কুটীরে গিয়া দেখিলেন যে উহা ভিতর হইতে বন্ধ। স্পষ্ট জ্যোৎস্না লোকে জানালা দ্বার দিয়া দেখিতে পাইলেন, এক দুরন্ত এক বৃদ্ধা রমণীর বুকে বসিয়া গলাটিপিয়া ধরিয়াছে ও তাহাকে "তোর কোথায় কি আছে বল" প্রশ্ন করিতেছে। পরদুঃখ-কাতর কৃষ্ণবাবু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সজোরে দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিলেন, উপর্য্যুপরি পদাঘাতে জীর্ণ কপাট তৎক্ষণাৎ ঝনঝন্ শব্দে মৃত্তিকা চুম্বন করিল। কৃষ্ণপদবাবু ত্বরিত পদে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও সজোরে দস্যুর পৃষ্ঠে পদাঘাত করিলেন, সে তখনই সিংহ বিক্রমে কৃষ্ণপদ বাবুকে আক্রমণ করিল; কৃষ্ণপদ বাবু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও দস্যুকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না, দস্যু ও সুযোগ বুঝিয়া গভীর জঙ্গলে অন্তর্হিত হইল।

এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য কৃষ্ণবাবু ভাবিতে লাগিলেন ও বাহিরে আসিলেন, এবং দূরে

পালকীর বেহারাদের শব্দ পাইতে লাগিলেন, বোধ হইল যেন কতকগুলি লোক এইদিকে আসিতেছে, বাস্তবিকই দেখিতে দেখিতে কতক গুলি লোক কুটীরের সম্মুখিন হইল। কৃষ্ণপদ বাবু আনন্দে অধীর হইলেন।

কৃষ্ণ বাবু দেখিলেন তাহারা সকলেই পুলিসের লোক ও সঙ্গে একজন স্থানীয় কৃষক; সে দারোগাকে সম্বোধন করিয়া বলিল:—"বাবু! এই ঘরে একজন লোক একটী বৃদ্ধাকে খুন করিতেছিল আমি দেখিয়াছি। দারোগা নিকটবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণপদ বাবুকে ঐ ভাবে ঐ স্থানে দাড়াইতে দেখিয়া এবং তাহার কাপড়ে রক্তের চিহ্ন দেখিয়া তাঁহাকেই খুন বলিয়া গ্রেপ্তার করিল। তৎপরে কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল বৃদ্ধার প্রাণ পাখী উড়িয়া গিয়াছে ও ঘর রক্তে ভাসিতেছে।

কৃষ্ণ বাবু বিপদ ঘনীভূত দেখিয়া তাঁহাদের সত্য ঘটনা অবগত করাইলেন ও তিনি যে ডাক্তার আনিতে যাইতেছেন, তাঁহার পিতা যে মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সে কথা বারং বলিলেন। কিন্তু তাহার কথা শুনে কে, বিশেষ ঐরূপ অবস্থায়! এক্ষণে তিনিই যে খুন করিয়াছেন ইহাই সার্ব্য হইল। কৃষ্ণ বাবু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ও দারগার দুই পায়ে জড়াইয়া ধরিলেন কিন্তু কিছুতেই পাষণ্ড দারোগার করুনা হইল না, পিতৃবৎসল পুত্র আর কোন উপায় নাই দেখিয়া তাহাদের সহিত যাইতে প্রস্তুত হইলেন। দারগার হুকুমে চৌকীদারগণ তাহাকে থানায় লইয়া চলিল, দারগাও সঙ্গে থানায় গমন করিলেন।

২

পাঠক! চলুন, একবার আমরা মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্রজেন্দ্র বাবুকে দেখিয়া আসি।

বৃদ্ধ ব্রজেন্দ্র বাবু রোগ যন্ত্রনায় বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতেছেন ও অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত করিতেছেন এবং থাকিয়াং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। পার্শ্বে মধ্যম পুত্র বধূ সুরবালা বসিয়া আছেন। শ্বশুরকে ঐরূপ চিন্তিত দেখিয়া বলিলেন—"তিনি ত আর সত্য সত্যই খুন করেন নাই। পরের উপকার করিতে গিয়া নিজে বিপন্ন হইয়াছেন। তাঁহার জন্য আর চিন্তা কি? বাবা! বিচারক অবশ্যই তাঁহার কথা শুনিবেন এবং যদি বিচারকের ভুল হয়, তাহা হইলে উপরে আর একজন বিচারক ত আছেন, তিনি ত আর কাহার ও কথা শুনিবেন না।"

বৃদ্ধ ধীরেং বলিতে লাগিলেন। মা! বৃদ্ধ বয়সে আর যে সহ্য হয় না, জানি না ভগবান আর কতকাল এ কষ্ট দিবেন। বাছা আমার যদি ডাক্তার আনিতে, না যাইত তাহা হইলে আর এ ঘটনা হইত না।

সুরবালা। বাবা! ঈশ্বরের দোষ দেওয়া বৃথা, তিনি কি ইচ্ছা করিয়া তাঁহার পুত্রগণকে কষ্ট দেন; আমরা যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত ফলভোগ করিতেছি। একদিন আপনিই ত এই দেশের রাজা ছিলেন, এখন আপনার এ অবস্থা কেন? সমস্তই কর্ম্ম ফল! যদি তিনি ডাক্তার আনিতে না যাইতেন তাহ

হইলে এই লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিত না। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যেদিন যাহা হইবার তাহা নিশ্চয় হইবে। মানুষ শত চেষ্টা করিয়াও তাহা রোধ করিতে পারিবে না। তাঁহার জন্য আর চিন্তা কি? তিনি নিশ্চয়ই পূর্ব্বে কোন পাপ করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁর আজ এই অবস্থা। তাঁহার পাপের শেষ হইলে তিনি মুক্ত হইবেন। বলিতে বলিতে সুরবালার চক্ষে অনর্গলিতে অশ্রু পতিত হইল বটে, কিন্তু মৃত্যু শয্যায় শায়িত শ্বশুরকে উদ্বিগ্ন করিতে তিনি ইচ্ছা করিলেন না। কেবল অদৃষ্টের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

ব্রজেন্দ্র বাবু উত্তর করিলেন। মা! তুমি আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, তুমি বিদ্যা ও বুদ্ধিমতী, তুমি পূর্ব্ব জন্মে আমার গর্ভধারিণী ছিলে সন্দেহ নাই। কারণ মা ভিন্ন অন্যের নিকট এরূপ শিক্ষা পাওয়া যায়। মা! তোমারই জন্যই এ বৃদ্ধের জীবন-প্রদীপ এখন নির্ব্বাপিত হয় নাই। তোমারই পুণ্যে এখনও দুই সন্ধ্যা খাইতে পাইতেছি। তুমি না থাকিলে এ সংসার কবে ছারেখারে যাইত। আহা! বিজুর কথা ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। দুষ্ট জমিদার তাহাকে চাকরি করিয়া দিবে বলিয়া এমন দেশে পাঠাইলে যে বাছা আমার আর ফিরিয়া আসিল না, বোধ হয় দুষ্ট আমার বিজুধনকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে। সেই অবধি বড় বৌমার মুখ দেখিলে আমার আর সংসারবাস ভাল লাগে না। আহা! মনীর পুতলী স্বামীর অবস্থা ভাবিয়া একেবারে পাগলিনী হইয়া গিয়াছে।

৩

আজ আসামীর বিচারের দিন, আদালত গৃহ লোকে লোকারণ্য। বলরামপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্র বাবুর মধ্যম পুত্র কৃষ্ণধন বাবু হত্যাপরাধে অভিযুক্ত, অনেকেই তাহার বিচার ফল দেখিতে আসিয়াছে। ঘড়িতে যখন টং টং করিয়া দশটা বাজিয়া গেল। সকলেই বিচারকের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে২ বিচারক মহোদয় আগমন করিলেন, সকলেই সসম্মানে অভিবাদন করিল।

বলা বাহুল্য—আসামী বন্দী অবস্থায় পূর্ব্ব হইতেই আনীত হইয়াছেন। কৃষ্ণবাবুকে আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল। নদীয়ার প্রধান উকিল মহোদয় আসামীর পক্ষ সমর্থনের জন্য উপস্থিত হইলেন। প্রথমে প্রধান সাক্ষী কৃষকের ডাক হইল।

কৃষক বলিতে লাগিল,—আমি গত বুধবার সন্ধ্যার পর সরীবপুরের মাঠ দিয়া যাইতেছিলাম, ঐ মাঠের ধারে এক বৃদ্ধা বাস করিত, তাহা পূর্ব্ব হইতে জানিতাম এবং তাহার দু পয়সা আছে—ইহা লোকমুখে শুনিয়াছিলাম। আমি কুটীরের নিকটবর্ত্তী হইলে, অকস্মাৎ গোঁয়ানী শব্দ শুনিতে পাইলাম। তখন আমি ধীরে ধীরে কুটীরের দ্বার ঠেলিলাম, দেখিলাম ভিতর হইতে বন্ধ, জানালার ছিদ্র দিয়া দেখিলাম—একটী মনুষ্য বৃদ্ধার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে। তাহার পর থানায় আসিয়া সংবাদ দিলে, দারোগা সাহেব আমার সহিত ঐ অকুস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং এই বাবুকে (আসামীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া) ঐ স্থানে দাঁড়াইতে দেখিয়া এবং উহার কাপড়ে

রক্তের চিহ্ন দেখিয়া গ্রেপ্তার করিলেন। আমি ইহা ভিন্ন আর কিছু জানি না।

বিচারক—আচ্ছা, যে দস্যু বৃদ্ধাকে মারিতেছিল, আসামী সেই ব্যক্তি কিনা বলিতে পার?

কৃষক—তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব।

বিচারক—এই তুমি বলিলে কাপড়ে রক্ত লাগিয়াছিল, দেখিয়াছি, এখন বলিতেছ জানিনা।

কৃষক—তবে বোধ হয় উনিই।

কৃষকের একেহার সমাপ্ত হইল এবং দারগা বকাউল্লা খাঁকে ডাক হইল। দারোগাও ঐ কথার সমর্থন করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে দশ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। অধিকন্তু যদি তাহার কিছু বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে ১৫ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে আপিল করিতে বলিলেন। এই অপরূপ বিচার দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করিতেং বাটী প্রস্থান করিল।

৪

জ্যোৎস্নাময়ী রজনী! আজ প্রকৃতির শোভা দেখে কে! নিশানাথ শশধর তারাহারে সজ্জিত হইয়া অদ্য পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত! বসুন্ধরা যেন রৌপ্যময় হইয়াছে। প্রভাত হইল ভাবিয়া বসন্ত সহচর তাহার স্বভাব সিদ্ধ স্বর সপ্তমে তুলিয়া ঝঙ্কার করিতেছে। সকলেই নিদ্রা দেবীর সুকোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছে! তাঁহার ভয় জ্ঞান নাই, স্থান অস্থান জ্ঞান নাই, তিনি সকলকেই সর্ব্বদা ক্রোড়ে লইতে ব্যস্ত। নিদ্রার মত এমন স্নেহময়ী আর কে আছে?

জগত সুপ্ত। কেবল নিশাচর পক্ষী সকল মাঝেং রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। গ্রাম কেবল চৌধাছার জমিদার কমলাকান্ত মিত্র মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শশীবালার চক্ষে নিদ্রা নাই, সে বাটী সংলগ্ন উদ্যানে প্রস্তর বেদীর উপর বসিয়া গভীর চিন্তা-মগ্ন, শশীবালা যুবতী, বয়স পঞ্চদশ অতিক্রম করিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই। মনের মত পাত্র পান নাই বলিয়া জমিদার মিত্র মহাশয় কন্যার বিবাহ দিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ কন্যাটীই তাঁহার সবে ধন নীলমণি। বিবাহ হইলেই ত পর হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় বিবাহ স্থগিত আছে। প্রথমে বলরামপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্র বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শচীন্দ্র নাথের সহিত বিবাহ দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, উভয় পক্ষই ইহাতে রাজী হইয়াছিলেন। অকস্মাৎ একটি জমি লইয়া উভয় পক্ষে মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইল এবং সেই মোকর্দ্দমায় ব্রজেন্দ্র বাবু জয় লাভ করিলেন। সুতরাং বিবাহ প্রস্তাব একেবারে চাপা পড়িয়া গেল। বলরামপুর হইতে চৌধাছা অর্দ্ধক্রোশ মাত্র ব্যবধান। শচীন বাবু শৈশব হইতেই মিত্র মহাশয়ের বাটীতে যাতায়াত করিতেন। শৈশবের খেলাধূলার সহিত শশী ও শচীনের ভালবাসা অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

অনেকক্ষণ উদ্যানে বসিয়া থাকিতে যুবতীর ভাল লাগিলনা। উঠিয়া মৃদুস্বরে গান গাহিতে গাহিতে দুই একটী পুষ্পবৃক্ষ হইতে পুষ্প চয়ন করিতে লাগিল। গায়িকার গীতটী এইরূপঃ—

কতদিন আর এরূপে রহিব বল।
আশা পথ চেয়ে তাঁর, জীবন বিফলে গেল,
আমি ভাবি সদা তার তরে,
তো গো দেখে না ফিরে,

তবু দিব আর মুখ যদিও বিরস বদন।
দেখা হলে আরবার ছাড়িব না কভু আর,
বলিব তুমি আমার আমি যে তোমার।

এমন সময়ে হঠাৎ পশ্চাদিক হইতে কে বলিল "কার আশা পথ চেয়ে" শশি। যুবতী পশ্চাতে দেখিয়া যেন কিছু অপ্রতিভ হইল, কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া পরে বলিতে লাগিল —পুরুষ কি নির্দয়, কে বলে পুরুষ সরল। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে আমি কখনই রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত এরূপ ভাবে এরূপ স্থানে একাকী বসিয়া থাকিতাম না।

দেখ শশী, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা নিতান্ত মিথ্যা নয়। কি করিব, যেজন্য মিথ্যা খুন-করা অভিযোগে ধরা পড়িয়াছেন, আজ বিচারে তাঁহার দশ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে, সেইজন্যই এত বিলম্ব। যুবতী দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া এবং তাহার বিচার ফল শুনিয়া নিতান্তই দুঃখিত হইলেন। এই গভীর রজনীতে জমীদার বাটীর গৃহ সংলগ্ন উদ্যানে এ অভিসারক আর কেহই নয়, যজ্ঞেশ্বর বাবুর কনিষ্ট পুত্র শচীন্দ্র নাথ।

শচীন্দ্র আজ বড়ই মর্ম্মাহত, অনিচ্ছা সত্বেও আসিয়াছেন বটে কিন্তু যুবকের আজ বড়ই ভাব ভার, যুবতীও সমদুঃখ ভোগ করিতে লাগিলেন। উভয়ে এইরূপ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া যুবক শোক বিজড়িত স্বরে বলিলেন ;—শশি! বিধাতা বিমুখ, আমাদের এ মিলন তাঁহার অভিপ্রেত নহে, নতুবা পদে পদে এত দুর্ঘটনা ঘটিবে কেন? যে বিপদকে পড়িয়াছি, আর বোধ হয় উদ্ধার হইতে পারিব না, আর বোধ হয় তোমার সহিত দেখা হইবে না, পিতা ও ভ্রাতার বিরহ ভাবিয়া আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি আর এদেশে থাকিবার ইচ্ছা নাই। দেশে থাকিব না শুনিয়া যুবতীর গণ্ডদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, গদগদ কণ্ঠে, সাহস শূন্য স্বরে বলিতে লাগিল ;—দেখ শচীন তোমার ন্যায় ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিকে আজ এরূপ অধৈর্য্য হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তুমি দেশের মায়া, জন্মভূমির মায়া আকর্ষণ কাটাইয়া, আর এই দাসীকে ফেলিয়া বিদেশগত হইবে?

শচীন।—দেখ শশি। বাল্য প্রণয়ে বিধাতার অভিশাপ আছে, তাহা না হইলে আমাদের বিবাহের ত সব ঠিক হইয়া গিয়াছিল, অকস্মাৎ তোমার পিতা আমার পিতার নামে নালিশ করিলেন এবং আমার পিতা উহাতে জয় লাভ করিলেন। সেই হইতেই আমাদের সাধের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

যুবতী সাক্ষাৎ ফণিনীর ন্যায় তেজোগর্ব্বে বলিয়া উঠিল,—তাহে নাই। কে বলিল আমাদের মিলন বিধাতার অভিপ্রেত নয়, আমি ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছি, তোমা ভিন্ন এ জীবনে আর কাহাকেও স্বামী বলিতে পারিব না।

দেখ শশি। এখনও তোমার পিতা বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার আদেশ অনুসারে তোমাকে চলিতে হইবে, তবে কেন ইচ্ছা করিয়া এ অভাগাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া চিরকালের জন্য দুঃখকে ডাকিয়া আন।

যুবতী।—এখ শচীন! সব ভুলিতে পারি, কিন্তু তোমায় এ জীবনে ভুলিতে

ভুলিতে পারিব না। পিতা পরিত্যাগ করেন করুন, তুমি আমি দুইজনে অরণ্যে গিয়া বাস করিব সেও ভাল, তথাপি এ হৃদয়ে অন্যের স্থান নাই। হিন্দু-কন্যার একবার বিবাহ হয়। যাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, সেই আমার সর্ব্বস্ব। আমি পিতার কথায় ধর্ম্ম ছাড়িতে পারিব না বা বিচারিণী হইতে পারিব না। ইহাতে যাহা হয় হউক, ক্ষতি নাই।

শচীন্দ্র যুবতীর ঐকান্তিকতা দর্শনে একান্ত মোহিত হইলেন। রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া তাহার নিকট হইতে সেদিনকার মত বিদায় হইলেন।

৫

ঈশ্বরেচ্ছায় আজ আমাদের পরোপকারী কৃষ্ণবাবু হাইকোর্টে আপীল করিয়া বেকসুর খালাস পাইয়াছেন। গ্রামে আনন্দ আর ধরে না। গ্রামের ইতর ভদ্র সকলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন এবং কিরূপে তিনি এই বিষম বিপদে পতিত হইয়াছিলেন তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কুল স্ত্রীরা অন্দর হইতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। কৃষ্ণপদ বাবু সকলকে যথা সম্ভব উত্তর দানে আপ্যায়িত করিতেছেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, সকলে আপন আপন আলয়াভিমুখে গমন করিলেন। দিনমণি পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িলেন। সরোজিনী পতি বিরহে ঘোমটায় বদন আচ্ছাদিত করিল। তাঁহাকে তারকাখচিত হীরাহারে খচিত হইয়া হাসিতে হাসিতে নীল নভোমণ্ডলে উদিত হইল। কুমুদিনী প্রিয়পতির আগমন সময় জানিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল ও কমলিনীর দুর্দ্দশা দেখিয়া ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। জগতের নিয়মই এই, একজন হাসে আর একজন কাঁদে। চিরকাল কাহারও কখনও সমান যায় না। আজ যিনি রাজ্যেশ্বর কাল তাঁহাকে পথের ভিখারি হইতে হইবে। আবার আজ যে ভিখারি কল্য সে রাজপদে অভিষিক্ত হইতে পারে।

রাত্রি দুই ঘটিকা উত্তীর্ণ। গ্রামস্থ ফেরুপাল চিৎকার করিয়া জন-সমাজে তাহা বিদিত করিল। কৃষ্ণবাবু অন্দরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার গুণবতী স্ত্রী এখনও নিদ্রা যান নাই, পতির অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। মধুর জ্যোৎস্নালোক তাঁহার মুখে পড়িয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছিল, মলয় মারুত তাঁহার কেশ গুলি লইয়া ইতঃস্তত খেলা করিতেছিল। সুরবালা পূর্ণ যুবতী। তাঁহার বয়স ঊনবিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে।" তাঁহার পাতলা পাতলা গঠন, টুকটুকে রাঙ্গা ঠোঁট দুখানি, ভাসা ভাসা বড় বড় চক্ষু আকর্ণ বিস্ফারিত, দশনপংক্তি যেন মুক্তা দিয়া সাজান, এলাইত কুন্তলজাল, অলক্তরাগ রঞ্জিত পদ স্পর্শ করাইবার জন্য যেন লালায়িত হইয়া ইতঃস্তত বিকীর্ণ হইতেছে।" কৃষ্ণ বাবু ধীরে ধীরে শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। সুরবালা তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। কৃষ্ণবাবু অনিমিষ নয়নে সেই অপরূপ রূপ রাশি দেখিতে২ একেবারে তন্ময় হইয়া গেলেন। তিনি একেবারে বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্য। কিয়ৎকাল এরূপ ভাবে থাকিবার পর সুরবালার চক্ষু হঠাৎ স্বামীর দিকে পড়িল, তিনি ত্বরিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও বলিলেন,—তুমি কখন এসেছ

আমি ত কিছুই জানিতে পারি নাই। এইবার কৃষ্ণবাবুর চমক ভাঙ্গিল। তিনি স্ত্রীর শয্যাতলে উপবেশন করিলেন। সুরবালা পার্শ্বে উপবেশন করিল।

কৃষ্ণ বাবু বলিলেন, এ যাত্রা যে রক্ষা পাব, সে আশা ছিল না। কেবল তোমারই সত্বীত্বতেজে এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম। তুমি যদি অলঙ্কার গুলি না দিতে, তাহা হইলে আমাকে আজীবন জেলে পচিতে হইত।

সুরবালা বলিলেন—দেখ স্বামীই স্ত্রীলোকের প্রকৃত ভূষণ, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের জগতে আর কে আছে, সামান্য টাকার জন্য তুমি জেলে থাকিবে, আর আমি গহনা পরিয়া সুখী হইব? অলঙ্কার কিসের জন্য, বিপদ আপদের জন্যই ত অলঙ্কার! আর এ সাজ সজ্জা সকলই ত তোমার জন্য। তুমিই যখন আমার জেলে গিয়া দারুণ কারাদণ্ড ভোগ করিতে লাগিলে, তখন কাহার জন্য আর অলঙ্কার পরিব। তুমি থাকিলে আমার কিতর অলঙ্কার হইবে। তুমিই আমার অলঙ্কার।

সতী স্ত্রীর কথাই ত এই। পাঠক আর কোন ধর্ম্মে এমন ত্যাগের মধুর মূর্ত্তি দেখিয়াছেন কি? হিন্দুর প্রতি ঘরে২ এই লক্ষীস্বরূপিণী রমণীরত্ন আছেন বলিয়াই পরপদলেহী, আজীবন দাসত্বকারী হিন্দু এখনও জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী।

কৃষ্ণবাবু বলিলেন—যাহা হউক, পুলিশ কি ভয়ানক জিনিস। এমন কাজ নাই যাহা তাহারা করিতে না পারেন। আমি একজন নির্দ্দোষী; অনায়াসে আমার দশ বৎসর কারাদণ্ড ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিল। যদি তোমার মত গুণবতী ভার্য্যা না থাকিত, তাহা হইলে আমার কি দুর্দ্দশা হইত, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। এইরূপ আমার ন্যায় কতশত নির্দ্দোষী ব্যক্তি যে, কারা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন।

সুরবালা বলিলেন, যাহা হউক বাবা, ক- এবার মরিতে২ বাঁচিয়াছেন, তিনি বলিতে-ছিলেন যে, কাশীবাস করিবেন। এই মেজো ঠাকুরপোর একটি বিবাহ দিবার উদ্যোগ কর।

বিবাহের ত সবই ঠিক হইয়াছিল, আর ঐ মেয়েটির সহিত বিবাহ হইলেই বেশ মানাইত। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় যখন তাহা হইল না, তখন অন্য পাত্রী দেখা যাউক। রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া উভয়ে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন।

৬

প্রভাত হইয়াছে। দিনমণি পূর্ব্ব গগনে রক্তিম রাগে রঞ্জিত হইয়া উদিত হইলেন। প্রাতঃ সমীরণ ধীরে২ বহিয়া যাইতেছে। পাপিয়া দহিয়াল প্রভৃতি অসংখ্য পক্ষী বিভুগুণ গানে মত্ত হইয়াছে। শ্যামল দূর্ব্বাদলে শিশির বিন্দু সকল পড়িয়া মুক্তার আকার ধারণ করিয়াছে। পুষ্পভারাবনত হইয়া বৃক্ষ সকল যেন বিধাতাকে অভ্যর্থনা করিতেছে।

পল্লীগ্রামে প্রায় সকলেই প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করেন। কারণ সকলেরই ২।৩ বিঘা জমি জমা আছে, কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নয়। কৃষকদিগকে তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া দিতে হইবে, কোথাকার কার্য্য কিরূপ সম্পন্ন হইল, তাহার তত্ত্বাবধান করিতে হইবে, ইত্যাদি।

আমাদের ব্রজেন্দ্র কিশোর বসু মহাশয় বৃদ্ধ হইলেও বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া লোকজনদিগকে অদ্য কি করিতে হইবে তাহা বলিয়া দিতেছেন এবং কৃষ্ণপদ ও শচীন্দ্র তাঁহারা উভয় ভ্রাতায় নানাবিধ সাংসারিক কথা কহিতেছেন।

"দেখুন মেজ দাদা, এ পর্য্যন্ত ও বড় দাদার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।"

"তাই আমি কি নিশ্চিন্ত আছি, তাঁহার জন্য আমি নানাস্থানে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছি। আজ তাঁহার সংবাদ পাইব এরূপ আশা আছে, দেখি ঈশ্বর কি করেন।"

এমন সময় ডাক হরকরা আসিল ও এক

খানি বৈবৈক্তি পত্র প্রদান করিল। পত্রের মধ্যে কি আছে জানিবার জন্য উভয়ে ব্যস্ত হইলেন, তখনই পত্র খুলিয়া ফেলা হইল। তাঁহারা যাহার জন্য এত চিন্তিত হইতে ছিলেন, তিনিই আজ নিজে পত্র লিখিয়াছেন। পত্রখানি এইরূপঃ—

পরম কল্যানীয়, শ্রীমান কৃষ্ণ পদ বসু, ভাইজীউ

স্নেহাস্পদেষু।

অনেক দিন হইল বাটীর কোন সংবাদ পাই নাই, তজ্জন্য বিশেষ চিন্তিত আছি। দুষ্ট জমীদারের প্ররোচনায় আমি এখানে যে কি বিপদে পড়িয়াছিলাম, তাহা সামান্য পত্রে কি জানাইব। এখানে আমি ৬০৲ টাকা বেতনে একটি কর্ম্ম করিতেছি। শীঘ্রই বাটী যাইব। পূজনীয় পিতাঠাকুর মহাশয়কে আমার শত প্রণাম জানাইবে ও তোমরা সকলে আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানিবে। অন্যান্য কথা সাক্ষাতে বলিব ইতি—

তোমারই দাদা বিষ্ণুপদ।

পত্র পাইয়া প্রথমে কর্ত্তাকে জানান হইল এবং বাটীতে সংবাদ দেওয়া হইল। অদ্য বসু বাটী আনন্দ সাগরে ভাসমান। সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দিত হইল একজন, সে বড়বউ প্রমদা, যিনি প্রায় ৪ বৎসর কাল স্বামীর কোন সংবাদ পান নাই, আজ তাঁহার যে কি আনন্দ তাহা সামান্য লেখনী মুখে ব্যক্ত করিতে অক্ষম। প্রিয় পাঠিকা! যদি আপনি কখন এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অনুভব করিতে পারিবেন।

৭

আজ রবিবার কমলাকান্ত মিত্রের একমাত্র কন্যা শশীবালার বিবাহ। দেবগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অমরেন্দ্র নাথ বসুর সহিত শুভ বিবাহ হইবে। আজ মিত্র বাটী আলোক মালায় সজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। সকলেই কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত। বরের জন্য আসর সাজান হইতেছে। পুত্র স্ত্রী ও নিমন্ত্রিত স্ত্রী মণ্ডলীতে বাটী পরিপূর্ণ, দেখিতে২ সন্ধ্যা হইল। আর বর আসিবার বিলম্ব নাই দেখিয়া বালকগণ ইতঃস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছে। সকলেই যে যার কাজে ব্যস্ত।

কন্যা সাজাইবার জন্য সকলে শশীবালার গৃহে গেলেন; কিন্তু শশীবালা কৈ! তখনই চারিদিকে অন্বেষণ করা হইল, কৈ কোথায় ত তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। তবে কি শশী বাগানে গিয়াছে, এত রাত্রেই বা তাহার উদ্যানে প্রয়োজন কি? চারিদিকে খোঁজ২ রব পড়িয়া গেল। এদিকে বর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিবাহের লগ্ন প্রায় অতিক্রম করিল। কিন্তু বিবাহ কাহার সহিত হইবে।

কতক্ষণের পর একজন চাকর আসিয়া সংবাদ দিল যে, উদ্যানের পশ্চিম দিকের পুষ্করিণীতে জল গুলাইয়া উঠিতেছে। তখন সকলে সেইদিকে ছুটিল। ৪।৫ জন তৎক্ষণাৎ জলে নামিল। বহুক্ষণ চেষ্টার পর শশীবালার অর্দ্ধ মৃত দেহ পাওয়া গেল, কিন্তু গ্রামেত কোন ডাক্তার কবিরাজ পাওয়া যায় না। কেবল বলরামপুরের ব্রজেন্দ্র কিশোর বসুর কনিষ্ঠ পুত্র শচীন্দ্র নাথ একমাত্র হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আছেন। প্রথমে তাহাকে ডাকিতে কর্ত্তা যেন কিছু দ্বিধা বোধ করিলেন, কারণ তাহাদের সহিত বিবাদ। শেষে সকলের অনুরোধে তাঁহাকেই ডাকা স্থির হইল। কিন্তু তিনি আসিবেন কি?

সেই মুহূর্ত্তেই একজন ভৃত্য বসু মহাশয়ের বাটী অভিমুখে ধাবিত হইল। বৃদ্ধ ব্রজেন্দ্র বাবু পুরাতন বন্ধুর অকস্মাৎ এই বিপদের কথা শুনিয়া তখনই শচীন্দ্রকে যাইতে আদেশ করিলেন। পিতৃবৎসল পুত্র তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শশীবালার চিকিৎসার জন্য যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

শচীন্দ্র বাবু আসিয়াছেন। তখনই রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ হইল। প্রথমে তিনি কৃত্রিম উপায় দ্বারা উদরস্থ জল বাহির করিলেন

ও অনবরত অগ্নির তাপ দিতে লাগিলেন। প্রায় ২ঘণ্টা পরিশ্রমের পর রোগিণী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল ও চক্ষু মেলিল। কিন্তু চাহিয়াই পুনরায় মূর্চ্ছিত হইল। পাঠক! এ মূর্চ্ছার কারণ বুঝিয়া লউন। তথায় থাকা আর বিধেয় নহে ইহার পর আর যাহা ২ করিতে হইবে তাহার ব্যবস্থা করিয়া শচীন্দ্র বিদায় লইলেন। এদিকে কন্যা মৃতপ্রায়, বিবাহ হইল না, বরপক্ষ তৎক্ষণাৎ গ্রামের জনৈক প্রতিবেশীর কন্যার সহিত শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফেলিলেন।

৮

পাটনা জেলার অন্তর্গত সাহিত্তা গ্রামের জমীদার শ্রীযুক্ত রাম শরণ তেওয়ারি মহাশয় অতিশয় ভদ্রলোক। তিনি এরূপ ভাবে বাস করেন, যে সহজে তাঁহাকে জমীদার বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। তেওয়ারি মহাশয়ের প্রায় ৪ কোটি টাকার সম্পত্তি। তাঁহার বাসভবন কেবলমাত্র একখানি দ্বিতল বাটি। বাহির মহলে জমীদারি সংক্রান্ত কাজ কর্ম হয় ও ভিতরে তেওয়ারি মহাশয় সস্ত্রীক বাস করেন। ইহা ভিন্ন খাস পাটনাতে তাঁহার বাড়ী আছে, তথায় কেবল বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজকর্ম হইয়া থাকে। তেওয়ারি মহাশয় অতিশয় ধার্ম্মিক, তিনি প্রতিদিন ১০০টি ব্রাহ্মণ ভোজন না করাইয়া জল গ্রহণ করেন না। শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি পূর্ব্বে অতিশয় দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু কি জানি কি করিয়া তিনি কমলার বরপুত্র হইয়াছেন। কেহ২ বলেন তিনি গুপ্ত ধন পাইয়াছেন। যাহা হউক তজ্জন্য আমাদের চিন্তার আবশ্যক নাই।

তেওয়ারি মহাশয়ের বাটীর সন্নিকটে একটী অন্নসত্র আছে। তাহাতে প্রতিদিন প্রায় ৪০০ ৫০০ শত লোক আহার করিয়া থাকে। যাঁহারা ভদ্র লোক, মানের ভয়ে সত্রে আসিতে পারেন না, তেওয়ারি মহাশয় তাঁহাদের বাটীতে চাউল দাইল প্রভৃতি পাঠাইয়া দেন, ইহা ভিন্ন আরও যে কত গুপ্ত দান আছে, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। আমাদের পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত শ্রীযুক্ত বিভূপদ বসু মহাশয় [illegible] জমীদার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কিশোর চৌধুরির কবলে পড়িয়া আজ এই সুদূর পাটনা সহরে আনীত হইয়াছেন। এখন যেমন চারিদিকে রেল হইয়াছে, তখন এরূপ ছিল না, হাঁটা পথে বা জল পথে গমনাগমন করিতে হইত। তবে যিনি ধনকুবের, তিনিই ঘোড়ার ডাক বসাইয়া গমনাগমন করিতেন।

কুচীয়ার উপেন বাবু প্রজাদিগের সহিত প্রায় বাদ বিসম্বাদ করিতেন এইজন্য বিভূবাবু তাঁহাকে ওরূপ গর্হিত আচরণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহাতেই তিনি তাঁহার বিষ নয়নে পড়িলেন। জমিদার মহাশয় তাঁহার ছিদ্রানুসন্ধানে ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না। তখন সিদ্ধান্ত করিলেন—এখন ইহাদের যেরূপ দুঃসময়, তাহাতে ইহাকে একটী বড় চাকরী দিব এরূপ বলিলে, ইহাকে যেখানে বলিব নিশ্চয় তথায় যাইবে। তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল। বিভূ বাবু তাঁহার কথায় রাজী হইলেন। জমীদার মহাশয় একজন ভৃত্য তাঁহার সমভিব্যাহারে দিয়া এই দূরদেশে পাঠাইলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, পথিমধ্যে দস্যুতে উহাকে নিশ্চয় বিনষ্ট করিবে তাহা হইলে আমি নিষ্কণ্টক হইব। কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে রক্ষা করিবেন, মানুষের কি সাধ্য তাহার অনিষ্ট করে। পথিমধ্যে তিনি যে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন নাই এরূপ নহে। দস্যুরা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার নিকট অভিলষিত অর্থ না পাইয়া তাঁহাকে তাহাদের দলে কর্ম্ম করিতে বাধ্য করিয়াছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় ২ মাস হইল তিনি দস্যু কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। ক্রমে এই সদাশয় মহাত্মার অন্নসত্রে আসিয়া উপস্থিত হন। গুণীর গুণ কখন গুপ্ত থাকে না, সময়ে তাহা নিশ্চয়ই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। তেওয়ারি মহাশয় তাঁহার আচার ব্যবহার দেখিয়া [illegible] সম্ভূত জানিতে পারিয়াছিলেন। [illegible] তাঁহাকে একটী প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার কার্য্য তৎপরতায় মুগ্ধ হইয়া তেওয়ারী তাঁহাকে সমস্ত

বিষয়ের কর্মকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছেন। তেওয়ারীর এত বিষয় সত্বেও জীবনে সুখ নাই, তিনি বিষম বাদ কাসের পীড়ায় আক্রান্ত। ঈশ্বর কখনও কাহাকে সর্ব্ব বিষয়ে সুখী করেন না। কোন না কোন একটি বিষয় তাঁহার নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ থাকে।

অদ্য কয়েক দিবস হইল, তেওয়ারি মহাশয়ের পীড়ার বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ক্রমে ইহা আরোগ্যসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। বৃদ্ধ তেওয়ারি মহাশয় বিষ্ণুপদকে পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করিতেন এবং তিনিও প্রভুকে পিতার ন্যায় মান্য করেন।

আজ কয়েকদিন হইতে বিষ্ণু বাবু আহার নিদ্রা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। সর্ব্বদাই প্রভুর চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত। ঘণ্টায়২ তিনি ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রভুর প্রাণ রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইতেছেন। কিন্তু যাহার কাল পূর্ণ হইয়াছে—তুমি আমি যত চেষ্টা করি না কেন, কিছুতেই রক্ষা হইবে না। দেখিতে২ বৃদ্ধের অন্তিম কাল উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ বিষ্ণু বাবুকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, দেখ বাবু আমি অনেক কষ্টে এই বিপুল ধন সম্পত্তির অধিপতি হইয়াছি, সামান্য তরকারি পর্য্যন্ত বাড়ী২ মাথায় করিয়া বিক্রয় করিয়াছি; তোমরা বাঙ্গালা দেশের লোক, তোমরা ঐরূপ কষ্ট সহ্য করিতে পার না; সেই জন্য তোমাদের চিরদুঃখ। যাহা হউক আমার পুত্রাদি নাই, তোমাকে পোষ্য গ্রহণ করিয়া একণে এই সম্পত্তি তোমাকেই দিয়া গেলাম; যেন ধনের সদ্ব্যয় হয়। বলিতে২ বৃদ্ধের কণ্ঠরোধ হইল, বিষ্ণু বাবু মুখে একটু গঙ্গোদক মিশ্রিত দুগ্ধ দিলেন ও তাঁহার স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ পুনরায় বলিতে লাগিলেন; চুপ কর, ভয় কি, এই তোমার ছেলে রহিল, চিরকাল কেহ এই জগতে থাকে না। সময় হইলেই যাইতে হইবে। না হয় দুই দিন অগ্র পশ্চাৎ। বৃদ্ধ বিষ্ণু বাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন তোমার এই মা রহিল, যেন ইহার কোন কষ্ট না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিও।" অমনি বোধ হইল বৃদ্ধের প্রাণপাখী পিঞ্জর ত্যাগ করিল।

তাঁহার সাধ্বী পত্নি সহমৃতা হইতে চাহিলেন। কিন্তু ইংরাজ রাজ্যে সে নিয়ম নাই, সুতরাং তাঁহাকে নিরস্ত হইতে হইল, কিন্তু সতী সাধ্বী কি ইংরাজ আইন গ্রাহ্য করেন। তিনি সেই মৃতের পার্শ্বে বসিয়াই "হা প্রাণেশ্বর কোথায় গেলে" বলিয়া মৃতের উপর ঢলিয়া পড়িলেন। সতী সেইখানেই প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রভু ও প্রভু-পত্নীর মৃত্যুতে বিষ্ণু বাবু যুগপৎ অস্থির হইলেন কিন্তু কি করিবেন ইহাতে ত মানবের হাত নাই, পরে যথা নিয়মে ব্রাহ্মণ দম্পতীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধে বিষ্ণু বাবু প্রায় ৩০ হাজার টাকা ব্যয় করিলেন। শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া বিষ্ণু বাবু কয়েক জন লোক সঙ্গে করিয়া দেশে আসিলেন। তাঁহার আগমনে গ্রামস্থ সকলেই আনন্দিত হইল। বৃদ্ধ পিতা হারানিধি পাইয়া ভগবানের চরণে কোটী কোটী প্রণাম করিলেন। যথা সময়ে অন্দরে এ সংবাদ পৌঁছিল; বিষ্ণুপত্নী প্রমদা বহুদিনের পর স্বামী সন্দর্শনে স্বর্গসুখানুভব করিলেন। ধর্ম্মের জয় হইল। অবীদার উপেন বাবুরও পাপের প্রতিফল আরম্ভ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

শক্তি পূজা।

আজ সমগ্র ভারত আনন্দসাগরে ভাসিতেছে। এত যে অন্নকষ্ট, এত যে মহামারী, এত যে জলকষ্ট, এত যে মনস্তাপ, সে সমস্তই আজ বিদূরিত। সকলের প্রাণেই আনন্দের উৎস প্রবাহিত! জানি না, কি দুর্ভেদ্য মায়ায় জীব আজ আত্মহারা। যাঁহার মায়ায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর পর্য্যন্ত ভ্রান্ত, সে মহামায়ার মায়া, আমরা সামান্য জীব কিরূপে বুঝিতে পারিব? সম্বৎসর পরে আমাদিগের জননী আসিয়াছেন, তাই আমরা প্রাণের বন্ধন উন্মোচিত করিয়া তাঁহার উভয় চরণপ্রান্তে দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। আমরা চিরদিন ঘোর দুষ্কৃতকারী, আমাদিগের মহাপাতকের কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে? তবে আমরা পুত্র বলিয়া জননী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। পুত্র যতই দুষ্কর্ম্মা হউক না, মা কখনই তাহাকে চরণে ঠেলিতে পারেন না। এই জন্যই মা আমাদিগকে প্রতিবৎসর শান্তি দিবার জন্য এই মর্ত্ত্যভূমে আগমন করেন। আমরা ভক্তিহীন, অবিশ্বাসী মহাপাতকী, কিন্তু জননী ত তা বলিয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না! এই গর্ব্বেই আমরা আজ আত্মহারা। ত্রিভুবন জননী ত্রিতাপহারিণী সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী, সর্ব্বদুষ্কৃতিনাশিনী মহামায়া আজ আমাদিগের নিকট অবির্ভূতা, আজ কি আর আমাদিগের কোনও নিরানন্দ থাকিতে পারে? মাগো ভুবনেশ্বরী, আমাদিগের যেন তোমার ঐ শ্রীপাদপদ্মে একান্ত অবিচল মতি থাকে, ইহাই আমাদিগের একমাত্র প্রার্থনা। তুমিই ত মা জীবগণকে সুপথে কুপথে পরিচালিত করিতেছ, মা!

তুমিই ত মা জ্ঞান, বুদ্ধি, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, শান্তি, মুক্তি, বিদ্যা, অবিদ্যা মাগো! তোমা ভিন্ন আর কিছুই নাই; তাই তোমায় অতি কাতর প্রাণে ডাকিতেছি, জননী! একবার অধম সন্তানগণের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত কর; তাহা হইলে আর আমাদিগের কিছুরই অপ্রাপ্তি থাকিবে না। এস ভাই, ভারতবাসিগণ আমরা সকলে মিলিয়া এই ঘোর দুর্দ্দিনে,—এই নিবিড় তমসাচ্ছন্ন রজনীতে, চিদানন্দময়ী জগজ্জননীর অভয় চরণপ্রান্তে শরণাগত হই।

যে ব্রাহ্মীশক্তি জগতে এক ও অদ্বিতীয়, যিনি ওতঃপ্রোতরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান, যাঁহাতে এই বিশ্ব বিধৃত রহিয়াছে, যাঁহাতে এই বিশ্ব বিলীন হইবে, যিনি ব্যতিরেকে জগতে আর কিছুই বিদ্যমান নাই। যিনি বিশ্বের প্রাণ, যিনি সূর্য্যের জ্যোতিঃ, অগ্নির

তেজ, বায়ুর বল, জলের শৈত্য যাঁহার মধ্যে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড জলবুদ্বুদের ন্যায় মুহূর্ত্তে উত্থিত ও বিলীন হইতেছে, যাঁহাকে দেবতারাও ধারণা করিতে সমর্থ নহেন এবং যাঁহাকে অল্পমাত্রও ধারণা করিতে গিয়া ক্ষুদ্র মানবের মন অভিভূত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আইসে, সেই মহাশক্তিকে ভক্ত হিন্দু পূজা করিবার নিমিত্ত, তাঁহার সামান্য মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির গঠন করে, তাঁহাকে সামান্য ফল মূল ও নৈবেদ্যের উপহার প্রদান করে এবং তাঁহার স্তোত্রপাঠ ও জপ গান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। কিন্তু ইহাই কি বিশ্বমাতার প্রকৃত পূজা? ইহাই কি তাঁহার প্রকৃত আরাধনা? বালক বালিকারা ধূলায় ঘর প্রস্তুত করিয়া যেরূপ গৃহস্থালীর অভিনয় করে, আমরাও তদ্রূপ বিশ্বমাতার মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাঁহার মহাপূজার অভিনয় করিয়া থাকি মাত্র। কিন্তু এই অভিনয়ের কি কোন সার্থকতা নাই? বালক বালিকার পক্ষে ধূলার ঘর প্রস্তুত করা যেরূপ স্বাভাবিক, সঙ্কীর্ণমনা মানব আমরা আমাদের পক্ষেও বিশ্বমাতার মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করা তদ্রূপ স্বাভাবিক। আমরা এই অভিনয় দ্বারা তাঁহার প্রকৃত মহাপূজার জন্যই আপনাদিগকে উপযুক্ত করিয়া থাকি। সম্মুখে মাতার মৃণ্ময়ী দশভূজামূর্ত্তি। অথচ তাঁহার পূজার সময়ে বলিতেছি "শরীরন্তে ন জানামি চেষ্টাং নৈব চ নৈব চ"—মা, তোমার দেহ যে কি প্রকার এবং চেষ্টাও যে কি, তাহা জানি না। পাঠক, এই মহাপূজার রহস্য অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছেন কি?

মৃণ্ময়ী প্রতিমাতেই হউক, ঘটেই হউক, পটেই হউক, আর মনেই হউক, এই মহাশক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া আমরা শরত কালে বিশেষভাবে তাঁহার পূজা করিয়া থাকি। মহাশক্তির পূজার উদ্দেশ্য শক্তিলাভ। শক্তিলাভ কিসের জন্য? আত্মরক্ষার জন্য, আত্মোন্নতির জন্য এবং সর্ব্বোপরি, জননীকে অবগত হইয়া মুক্তিলাভের জন্য। আত্মরক্ষার জন্য আমরা আয়ু চাই, ধন চাই, ভাগ্য চাই, পুত্র চাই। এই কারণে আমরা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি :—

আয়ুর্দ্দেহি, যশো দেহি, ভাগ্যং
ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি, ধনং দেহি, সর্ব্বান্
কামাংশ্চ দেহিমে॥

পাঠক এইরূপ প্রার্থনায় কি কোনও দোষ আছে? নিষ্কাম ধর্ম্মের উপাসক বলিবেন, "ইহা সকাম উপাসনা সুতরাং নিকৃষ্ট।" নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্টের আলোচনা এখানে করিব না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আয়ু কি আমাদের প্রার্থনীয় নহে? যদি বাঁচিয়াই না থাকি, কিরূপে মাতার পূজা করিব, অথবা তাঁহাকে অবগত হইতে সমর্থ হইব? আয়ুর জন্য কি ধন যশঃ ও ভাগ্যের আবশ্যকতা নাই? ধন না থাকিলে আমি কিরূপে প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইব? পুত্র না থাকিলে, কে আমাকে অসহায় বৃদ্ধাবস্থায় রক্ষা করিবে? সুযশ না থাকিলে, কিরূপে আমি সমাজে বাস করিতে সমর্থ হইব? যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" শরীরই ধর্ম্মসাধ-

নের পক্ষে আদ্য যন্ত্র। দেহ নীরোগ না হইলে, কিরূপে আমি ধর্ম্মসাধন করিতে সমর্থ হইব? আর নিষ্কাম ধর্ম্মের কথা বলিতেছেন? কোথায় আমি এই ধর্ম্ম শিক্ষা করিব? পুত্র কলত্র সমন্বিত পরিবারবর্গের মধ্যেই কি এই ধর্ম্ম শিক্ষার আরম্ভ হয় না? গৃহেই কি আমরা আত্মত্যাগ শিক্ষা করি না? আর ধন না থাকিলে, কেবল বক্তৃতা করিয়াই কি আমরা পরোপকার সাধন করিতে পারি? এই যে বঙ্গদেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে,—এই যে শত শত নরনারী ও বালক বালিকা অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, ইহাদের প্রাণরক্ষার জন্য কি ধনধান্যের আবশ্যকতা নাই? ধন সঞ্চয় করিয়া যদি আমি আত্মরক্ষাই করিতে সমর্থ না হই, তাহা হইলে আমি পরো-পকার সাধন করিব কিরূপে? নিষ্কাম ধর্ম্ম কি আকাশ হইতে নিপতিত হয়? প্রফুল্ল পঙ্কজের উৎপত্তি কি পঙ্কেই নহে? আহা যে প্রফুল্ল কমলকে আপনি ভগবতীর পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হন, পঙ্ক না থাকিলে, সেই কমলের জন্মই হইত না। নিষ্কাম উপাসনা শ্রেষ্ঠ, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু সকাম উপাসনা হইতেই তাহার উৎপত্তি। সুতরাং সকাম উপাসনা কিছুতেই অবজ্ঞেয় নহে।

আত্মরক্ষা ব্যতীত আত্মোন্নতির জন্যও শক্তিলাভের আবশ্যকতা আছে। পরের উন্নতি এবং স্বদেশের উন্নতির সহিত আত্মোন্নতি অভিন্নভাবে বিজড়িত। সুতরাং আত্মোন্নতি সাধন করিতে হইলে, অপর দশজনের এবং স্বদেশেরও উন্নতি সাধন করিতে হইবে। মনে করুন, আপনার একটি পুত্র আছে। আপনি পুত্রটিকে শিক্ষিত ও জ্ঞানী করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু পল্লীতে তাহার সমবয়স্ক যে সকল বালক আছে, তাহারা অতীব দুষ্ট। আপনার পুত্রটী সেই দুষ্ট বালকগণের সহিত মিলিত হয়। এরূপ অবস্থায় আপনার পুত্রকে জ্ঞানী ও শিক্ষিত করা সহজসাধ্য নহে। কিন্তু আপনি আপনার পুত্রের ন্যায় পল্লীর সেই দুষ্ট বালকগণকেও যদি শিক্ষিত ও জ্ঞানী করিতে যত্নবান হন, তাহা হইলে, আপনার পুত্রেরও পক্ষে শিক্ষিত ও জ্ঞানী হওয়া কঠিন হইবে না। "পরার্থে স্বার্থের সিদ্ধি" এই কথা সত্য কিনা, তাহা ভাবিয়া দেখুন। আত্মো-ন্নতি সাধন করিতে হইলে, অপর দশজনের উন্নতি সাধন অবশ্যই করিতে হইবে। সুতরাং আত্মোন্নতি সাধনের জন্য শক্তি প্রার্থনা করিলে, সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্যই শক্তি প্রার্থনা করা হয়।

নিষ্কামধর্ম্মকে সাধনা করিতে পারেন? যিনি নিজ আত্মাতে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন এবং সর্ব্বভূতের মধ্যে আপনাকে দর্শন করেন এক কথায় বলিতে গেলে, যাহার আত্মা বন্ধন-মুক্ত এবং ব্রহ্মাণ্ডময় প্রসারিত হইয়াছে, তিনিই নিষ্কামধর্ম্ম সাধনের অধিকারী। কেননা, এই-রূপ ব্যক্তিই আত্মপর ভেদাভেদরহিত এবং প্রকৃত আত্মত্যাগেসমর্থ, কিন্তু এই ভেদাভেদ রাহিত্য ও আত্মত্যাগসামর্থ্য কোথা হইতে আইসে? গৃহেই এই শক্তি জন্মগ্রহণ করে, গৃহেই আমরা আত্মত্যাগ শিক্ষা করি, গৃহেই নিষ্কামধর্ম্মের পত্তন হয়। আমরা ধন উপার্জ্জন করি, তাহা কি কেবল আত্মসুখ ও সুবিধার

জন্য? না, পুত্র কলত্র ও আত্মীয় স্বজনকে সুখে রাখিবার জন্য? এইখানেই কি আত্মত্যাগের শিক্ষা হইতেছে না? এইখানেই কি আত্মা অল্পে অল্পে বন্ধনমুক্ত হইয়া প্রসারিত হইতেছে না? আমার পরিবারবর্গ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে; কিন্তু আমার প্রতিবাসী গৃহস্থগণ অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। আমার গৃহে ধনধান্য থাকিলে, আমি কি তাহাদিগকে না খাইতে দিয়া নিজে কিছু খাইতে পারি? দেখুন এইখানে আত্মা আরও প্রসারিত হইতেছে। তৎপরে যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই দেশের দুরবস্থা উপস্থিত হইলে, আমার মন ব্যথিত হয় এবং স্বদেশবাসিগণের মঙ্গলসাধনের জন্য ধনপ্রাণ নিয়োজিত করিতে ব্যাকুল হইয়া পড়ি। এইখানেই আত্মত্যাগ ও আত্মপ্রসারের আরও অবসর আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। তৎপরে, স্বদেশকে সমুন্নত ও গৌরবান্বিত করিয়া যদি দেখিতে পাই যে অন্যদেশ কোনও কারণে অবনতির পঙ্কে নিমগ্ন রহিয়াছে তাহা হইলে, সেই দেশেরও মঙ্গল সাধনের জন্য আমরা প্রাণে ব্যাকুলতা অনুভব করি এবং প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিতে থাকি। জাপান আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা সাধনপূর্ব্বক প্রতিবাসী চীনের দুরবস্থায় ব্যথিত হইয়া তাহারও উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতেছে, তাহা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। আত্মার প্রসার এইরূপেই হইয়া থাকে। পরিশেষে মানবাত্মা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে মানব মাত্রেরই মঙ্গলসাধন করিতে ব্যাকুল হয়। এইরূপে আত্মা মোক্ষের পথে অগ্রসর হইয়া থাকে এবং নিষ্কামধর্ম্মের অধিকারী হয়।

এই যে মোক্ষ, এই মোক্ষের মূল কোথায়? ক্ষুদ্র বদ্ধ আত্মার মধ্যে দুর্গোৎসব বা মহাশক্তির পূজা এই বন্ধনমোচনের প্রথম সোপান। আত্মমঙ্গলের উপরেই জগতের মঙ্গল, এবং আত্মোন্নতির উপরেই জগতের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। শক্তির উপাসনা দ্বারাই এই আত্মমঙ্গল ও আত্মোন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। এই কারণে শক্তির উপাসক বিশ্বেশ্বরী জগন্মাতার নিকট প্রথমেই আয়ু, ধন, যশঃ পুত্র আরোগ্য, বিজয় প্রভৃতির প্রার্থনা করিয়া থাকেন। পাঠক, আমাদের আত্মমঙ্গল বা আত্মোন্নতি নাই। আমরা পরপদানত, বিজিত ও নিপীড়িত। আমাদের দেহে বল নাই, মনে শক্তি নাই, হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি নাই, আমাদের গৃহে অন্ন নাই, অঙ্গে বস্ত্র নাই, দেশে ধন নাই। আমাদের শিল্প বাণিজ্য বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা অন্নের জন্য হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছি। বর্ষে বর্ষে লক্ষ লক্ষ নরনারী অনাহারে কালকবলে নিপতিত হইতেছে। রোগে, শোকে, ক্ষোভে, কষ্টে আমরা জর্জ্জরিত হইয়াছি। কে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন? কে আমাদের দুর্গতি নাশ করিবেন? কে আমাদের বাহুতে বল, মনে তেজ ও হৃদয়ে শক্তি প্রদান করিবেন? কে আমাদের শোক তাপ বিদূরিত করিবেন? কে আমাদিগকে জীবন সংগ্রামে বিজয়ী করিবেন? কে আমাদিগকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবেন, যিনি মহাশক্তি, যিনি সর্ব্বমঙ্গলা, যিনি অন্নপূর্ণা, যিনি দুর্গা, তিনিই আমাদের একমাত্র গতি, তিনিই আমাদের শরণ্য; তিনিই আমাদের সর্ব্বমঙ্গলসাধিকা।

আসুন পাঠক, আমরা দরবিগলিত নেত্রে, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই মহাশক্তির উদ্বোধন করিয়া তাঁহার ধ্যান করি। আসুন, সকলে সমস্বরে বিশ্বজননীর নিকট প্রার্থনা করিঃ—

হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাশুভম।
হর রোগং হর ক্ষোভং হর মারং হরপ্রিয়ে॥

মা, হরপ্রিয়ে, তুমি আমাদের পাপ, ক্লেশ, শোক, অশুভ, রোগ, ক্ষোভ ও মার সমস্তই হরণ কর। আরও প্রার্থনা করি—

সংগ্রামে বিজয়ং দেহি ধনং দেহি সদাগৃহে।
ধর্ম্মকামার্থ সম্পত্তিং দেহি দেবি নমোস্তুতে॥

এই কঠোর জীবনসংগ্রামে তুমি আমাদিগকে বিজয় প্রদান কর ; তুমি সর্ব্বদা আমাদের গৃহে ধন দান কর এবং আমাদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম্যবস্তু ও সম্পত্তি দাও। শেষে এই কথাও বলিতে যেন বিস্মৃত হইয়া না যাইঃ—

কায়েন মনসা বাচাবস্তো নান্যাগতির্ম্মম।

মা, আমাদের কায়ে মনে ও বাক্যে, তুমি ভিন্ন আর কেহ গতি নাই।

পাঠক, বিশ্বজননীর মহাপূজা সমাগতা। আপনি হিন্দু হউন মুসলমান হউন ব্রাহ্ম হউন, আর খৃষ্টান হউন, এই ব্রাহ্মীশক্তির মানসীপূজা, বা ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া ধন্য হউন। এই মহাশক্তিই আল্লা জিহোবা, গড, ব্রহ্ম অথবা দুর্গা, কালী অন্নপূর্ণা বা জগদ্ধাত্রী। স্বদেশপ্রাণ ও স্বদেশভক্ত ভ্রাতৃবৃন্দ, বিশ্বজননীর কৃপালাভ করিয়া স্বদেশের মঙ্গলসাধনের জন্য ধন-প্রাণ দেহ-সম্পত্তি সমস্তই নিয়োজিত করুন। মা বিশ্বেশ্বরী আমাদের ও স্বদেশের হিত সাধন করুন।

শ্রীউপেন্দ্র মোহন চৌধুরী কবিভূষণ বি, এ।

শরত সমাগম।

—:•:—

শরতের সুপ্রকাশে বরষা বিক্রম নাশে
দশদিকে দশদিক্ সুনির্ম্মল হইল।
মরি মরি হায় হায় কেঁদে প্রাণ যায় যায়
আমার হৃদযে কেন মলিনতা রহিল।
আকাশের অশ্রুজল, বহিত যা অনর্গল
গেল তাহা, মম অশ্রু নিবারিত নহিল।
বিমান হৃদয়স্থল নিভিল চপলানল
মমহৃদে বিরহাগ্নি কেন নাহি নিভিল।
বরষার দীর্ঘশ্বাস অনুরূপ যে বাতাস
বহিত প্রবল, তাহা শরতেতে ঘুচিল।
প্রিয়জন অসংযোগে বিষম বিরহ রোগে
মম দীর্ঘশ্বাস আরো প্রবলতা ধরিল।
জলদ কাতর স্বর শরতেতে সমস্তর
মম আর্ত্তনাদ আরো এ সময়ে বাড়িল।
শরতে পুলকে পূর্ণা অবনী কর্দ্দম শূন্যা
আমার হৃদয় ক্ষেত্র আঁখিনীরে ভাসিল।
শারদীয় শশধর ধরি পূর্ণ কলেবর
গগন হৃদয়াসনে সমাসীন হইল।
পিয়া তার কর সুধা চকোরের গেল ক্ষুধা
ক্ষোভানলে আর তার হৃদয় না দহিল।
মম হৃদাকাশোপর প্রাণেশ পীযূষাকর
একি দায় আজো কেন, সমুদিত নহিল
কাতর চকোর মন হায় হায় কি কারণ
প্রিয়-প্রেম-সুধাপানে প্রবঞ্চিত রহিল।
হেরি প্রিয় প্রাণেশ্বরে নিশি চারু শোভা ধরে
কুমুদিনী সরোবরে প্রেমভরে ফুটিল।
খুলিল মুখের বাস, মৃদু হাস সুপ্রকাশ
হৃদয়ে সুখের সিন্ধু উথলিয়া উঠিল।

না হেরিয়ে প্রাণাধারে মম চিত্তসরোবরে
আশা কুমুদিনী ফুল, প্রফুল্লিত নহিল
এ যাতনা বলি কায় বরষা শরত যায়
আজো মম মনোদুঃখ মনেতেই রহিল।

শ্রীবিপিন চন্দ্র চৌধুরী।

ঔদাস্য।

—:•:—

খুজিয়া খুজিয়া আপনার পথ
জানি না কেন পাই না
করি, করি যাহা করি নিরূপিত
যেন তবু তা চাই না।
আপনার কাজ আপনি জানিনা
কি যে করি নাহি স্থির
তবু প্রাণ মোর আকুল আহ্বানে
নিয়ত ঢালিছে নীর॥
কি আছে আমার করিবার তরে
বলিয়া দিবেকি কেউ?
ঔদাস্য লইয়ে সংসার সাগরে
গনিব কি শুধু ঢেউ।

শ্রীললিত রঞ্জন সমদ্দার।

মুসলমান আমলে বঙ্গভাষার উন্নতি।

—:•:—

বাঙ্গালাদেশে মুসলমানগণের প্রথম আমলে তুমল হলস্থূল বাধিয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার তুল্য দ্বিতীয় ঘটনা আর নাই। ইহার পর হইতে বাঙ্গালাদেশের অধিবাসীগণ হিন্দু মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। একই দেশের অধিবাসী হইয়াও ইহাদের ঐক্যের স্থলে অনৈক্য, মৈত্রী স্থলে বৈরতার আরম্ভ হইয়াছে।

মুসলমান আগমনে বাঙ্গালাদেশে যে নূতন রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা দেড়শতাধিক বর্ষ নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে; কিন্তু এই দীর্ঘ-কাল একই দেশে বাস করিয়াও হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের বিবাদ নির্ব্বাপিত হয় নাই। কত দিনে যে তাহাদের মধ্যে সাম্যভাব স্থাপিত হইবে তাহা জগদীশ্বর তিনিই বলিতে পারেন।

মুসলমান রাজত্বের পর হইতে অদ্য পর্য্যন্ত দেড়শতাধিক বর্ষ ভারতবর্ষ ইংরাজ অধিকারে আছে। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে বৈদেশিকগণ আমাদের ধন সম্পত্তি যেরূপ গ্রহণ করিয়াছে; কয়েক বৎসরের মধ্যে মুসলমানগণ তদপেক্ষা অধিক গ্রহণ করিয়াছিল, ইহা ধ্রুব সত্য। গজনী রাজ সুলতান মামুদের অষ্টাদশবার ভারত আক্রমণ, ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন ও দেব-মন্দির চূর্ণীকরণ, যতদিন ভারতে হিন্দু থাকিবে ততদিন হৃদয়ে জাগরূক রহিবে তাহাও সত্য। কিন্তু যেদিন হইতে মুসলমানগণ ভারতে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, যেদিন হইতে তাহারা হিন্দুদের ন্যায় বাঙ্গালার মাটি ও বাঙ্গালার ফলে জলে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন, যেদিন হইতে হিন্দু মুসলমান একই আকাশের তলে, একই হাওয়ায় পুষ্ট হইতে লাগিলেন, তখন হইতে তাহারা ভারতের শত্রু নন, মিত্রভাবে বাঙ্গালাদেশের উন্নতির জন্য মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহারা হিন্দুদের সঙ্গে একত্রে বাস করিতে লাগিলেন। হিন্দুদের